বাহান্নর ভাষা আন্দোলন

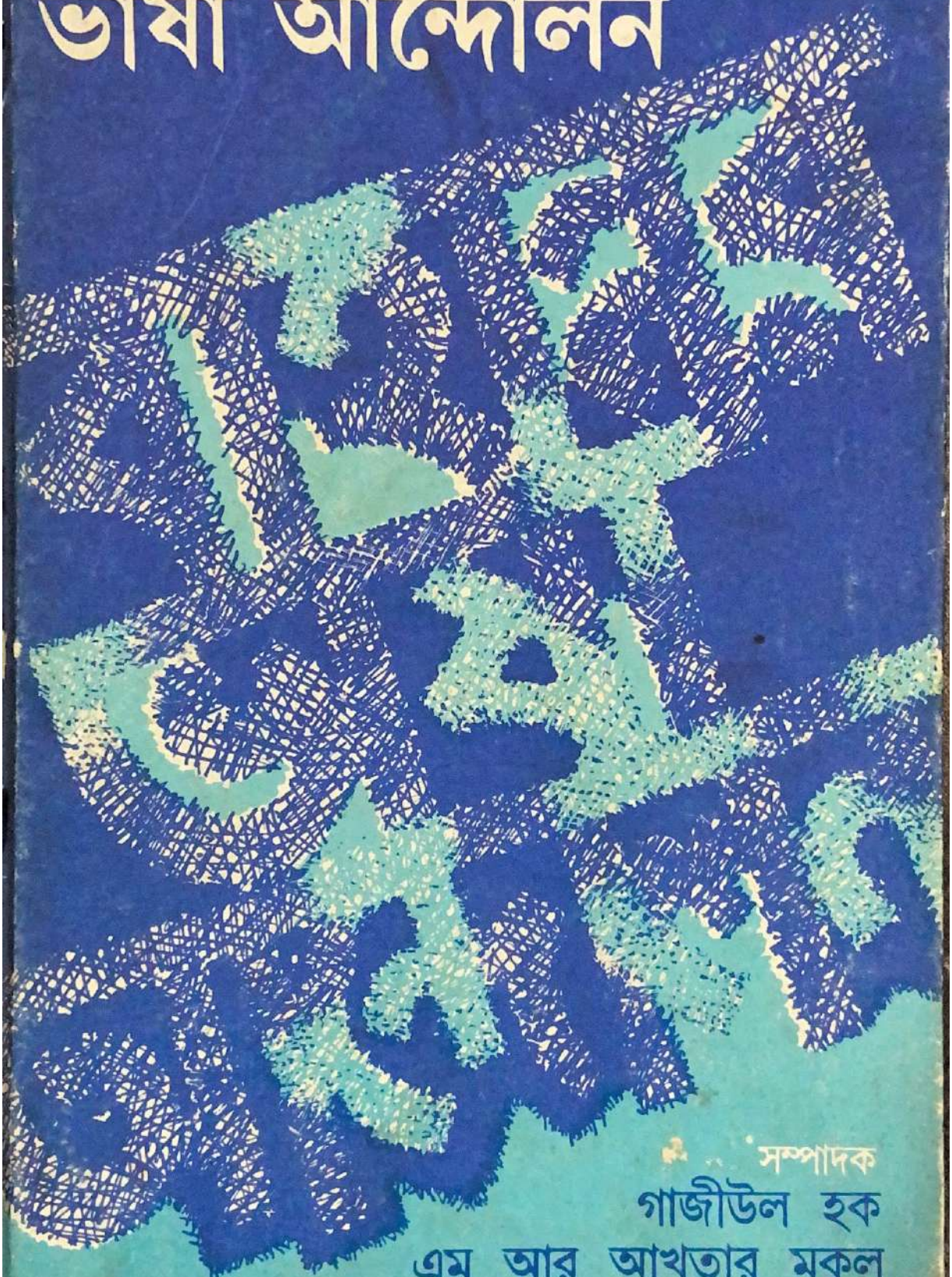

সম্পাদক
গাজীউল হক
এম আর আখতার মুকুল

বাহান্নর ভাষা আন্দোলন

সম্পাদনায়

গাজীউল হক
এম আর আখতার মুকুল

এম আর আখতার মুকুল প্রণীত

আমি বিজয় দেখেছি

মতামত

গণমানুষের হাতে একটি শানিত হাতিয়ার

গাজীউল হক

বইটি আমি পড়েছি একটানা দু'বার। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বাংলাদেশ বেতারের বহুনন্দিত অনুষ্ঠান 'চরম পত্রের' লেখক ও পাঠক এম আর আখতার মুকুলের কলম থেকে মুক্তিযুদ্ধের চৌদ্দ বছর পরে বেরিয়ে এসেছে "আমি বিজয় দেখেছি"। ১৯৪৭ সাল থেকে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের টুকরো টুকরো নক্সা, স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন স্মৃতির রোমন্থন এবং অসংখ্য প্রামাণ্য দলিল ও তথ্যের সমাবেশে ঐশ্বর্যমন্ডিত বই "আমি বিজয় দেখিছি"।

স্বাধীনতা যুদ্ধের এক সেনা নায়কের প্রত্যক্ষ আশ্রয় এবং সহায়তায় যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ-বিরোধী রাজাকার এবং আলবদরদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বাধ্যানুগত দাসেরা যখন 'আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি' বলে মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত ও কলঙ্কিত করার এবং গণমানুষকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত, তখন স্বাধীনতা যুদ্ধের এক প্রথিতযশা শব্দ সৈনিক এম আর আখতার মুকুল 'আমি বিজয় দেখেছি' লিখে শুধু স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লেখার দায়িত্বই পালন করেননি, বরঞ্চ স্বাধীনতা যুদ্ধ বিরোধীদের নয়া যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং নয়া আক্রমন পরিচালনার বিরুদ্ধে নব পর্যায়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য গণমানুষের হাতে একটি শানিত হাতিয়ার তুলে দিয়েছেন।

লেখকের পরিচিতি লিখেছেন বেলাল চৌধুরী। ভূমিকা লিখেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর আনিসুজ্জামান। ভূমিকাটিতে বইয়ের বিষয় বস্তুর ধারণা এবং লেখকের মন-মানসিকতা বিধৃত। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "- - - - - মুজিবনগর সরকারের প্রশাসনকে ভেতর থেকে অনেকখানি দেখার এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রক্রিয়াকে ঘনিষ্টভাবে জানার সুযোগ তাঁর হয়েছিলো। তিনি যা দেখেছিলেন ও শুনেছিলেন সে সব দলিল সংগ্রহ-করেছিলেন, যে সব বিষয় অনুমান করেছিলেন এবং প্রাসংগিক যে সব তথ্য পরে তাঁর গোচরীভূত হয়েছিল, তার সবই 'আমি বিজয় দেখেছি' গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে।

তবে এই বই হাতে নিলেই বোঝা যাবে, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ও ১৬ই ডিসেম্বরের কালসীমায় বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখেননি লেখক।- - - - - - অনেক বিষয় এতে তিনি অবতারণা করেছেন যা প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের সংগে সম্পর্কিত নয়, কিন্তু যা মুক্তিযুদ্ধের পটভূমির উপকরণ হিসেবে বিবেচ্য।"

'আমি বিজয় দেখেছি' গ্রন্থটি যদিও কোন বিশেষ অধ্যায়ে চিহ্নিত নয় এবং এতে কোন সূচীপত্রও নেই, তবুও বইটি গ্রন্থকার যেভাবে সাজিয়েছেন তাতে মোটামুটি একে তিনটি অংশে ভাগ করা চলে। বারো পৃষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে আটচল্লিশ পৃষ্ঠা প্রথম অংশ, উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা থেকে তিন'শ ষোল পৃষ্ঠা পর্যন্ত দ্বিতীয় অংশ এবং তিন'শ ষোল পৃষ্ঠা থেকে চার'শ বত্রিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শেষাংশ অথবা পরিশিষ্ট।

প্রথমাংশে কিছু দুর্লভ ছবির মধ্যে রয়েছে নতজানু পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর ছবি এবং নিয়াজীর আত্মসমর্পনের দলিল ও দলিলে স্বাক্ষরের ছবি। তাছাড়া এ অংশে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের বক্তৃতা, স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে দুটি মূল্যবান দলিল, নির্বাসিত অস্থায়ী সরকারের প্রশাসনিক বিভাগ এবং সামরিক বিভাগের অফিসারদের একটি তালিকা, বাংলাদেশ স্থলবাহিনীর বিন্যাসের ও বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর সৃষ্টির প্রামাণ্য তথ্যসহ একটি অতি মূল্যবান সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

গ্রন্থটির বিরাট এলাকা জুড়ে রয়েছে দ্বিতীয় অংশটি। এই অংশের গোটা মেজাজটিই বৈঠকী গল্পের মেজাজ। কিন্তু নির্লিপ্ত নিরপেক্ষ বর্ণনা নয়। নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে বর্ণনা। বৈঠকী মেজাজে তিনি বিবৃত করেছেন এক জাতির উত্থানের ইতিহাস, স্বাধিকারের আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস; কখনো গল্পচ্ছলে, কখনো স্মৃতিচারনের ঢংএ, অভিজ্ঞতা বর্ণনার কৌশলে, আবার কোথাও ঐতিহাসিকের গুরু দায়িত্ব নিয়ে। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বন্ধুদের চারিত্রিক মাধুর্য এবং সাফল্যের কাহিনী যেমন বলেছেন, তেমনি প্রয়োজনবোধে তাদের ত্রুটি দেখিয়ে আঘাত করতেও দ্বিধা করেননি। আবার নিজের শ্রেণী চরিত্রের কথা বলতে গিয়ে তার অক্ষমতার কথা প্রকাশ করে নিজ শ্রেণীর প্রতি ব্যঙ্গ করতেও কসুর করেননি। প্রতিক্রিয়াশীল অশুভ শক্তিকে তিনি যেমন তীব্র আঘাত করেছেন, তেমনি সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী বামপন্থীদের মৃদ ভৎর্সনা করতেও কার্পন্য করেননি। অবশ্য বামপন্থীদের ওপর তার যে ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে তা শত্রুতামূলক নয়, বন্ধুত্বমূলক। তিনি সুদীর্ঘকাল ধরে তাদের কাছে যা প্রত্যাশা করেছিলেন তা পাননি বলেই এই ক্ষোভ।

গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশটি ৭০টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ঈদ উপলক্ষে আনা মুরগীর গোশ্ত থেকে ছেলে মেয়েদের বঞ্চিত করে বন্ধু ও মুক্তিযোদ্ধাদের আপ্যায়ন এবং শ্যামবাজারের মোড়ে নাট্যশালায় অনুষ্ঠিত সভার স্মৃতিচারণ দিয়ে আরম্ভ হয়েছে এ অংশটি। দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম অধ্যায়ে আবার ফিরে গেছেন ২৫শে মার্চের নারকীয় ঘটনার বিবরণে, বগুড়া, সিরাজগঞ্জে প্রতিরোধ লড়াই এর বর্ণনা এবং তারপরের দিনগুলির স্মৃতিচারণে। ঢাকার পাকিস্তানী সেনাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নারকীয় হত্যাকান্ড এবং প্রাণভয়ে পলায়ন পর একটি পরিবারের কাহিনী বর্ণনায়। সপ্তম অধ্যায় থেকে শুরু করেছেন কোলকাতা এবং মুজিবনগরের স্মৃতিচারণ। এর ফাঁকে ফাঁকে বলেছেন অতীত ইতিহাস, ভারতীয় রাজনীতির তৎকালীন অবস্থার কথা, নক্সাল আন্দোলনের উত্থান এবং দমনের কাহিনী। এই অংশে লেখক এম, আর আখতার মুকুল সবারই প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছেন। তবে ধিক্কার দিয়েছেন উগ্রবামপন্থী নেতাদের ভৎর্সনা করেছেন নিপীড়ক ভারতীয় প্রশাসনকে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্ম ইতিহাস বর্ণনাকালে বন্ধুদের স্মৃতিচারণ করেছেন। বিশ্বস্তভাবে চেষ্টা করেছেন বন্ধু এবং সাথীদের অবদান সম্পর্কে তথ্য জানাতে। স্বাধীনতা যুদ্ধ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ষড়যন্ত্রের কাহিনীও বর্ণনা দিয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'জয়বাংলার' আত্মপ্রকাশের কাহিনীর বিবরণ দিতে গিয়ে কিছু ছাত্র নেতার উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কথা জানাতেও ত্রুটি করেননি।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় অংশের পাতায় পাতায় স্মৃতিচারণ, চরিত্র চিত্রণের সংগে আছে অসংখ্য তথ্য। পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের তথ্য, স্বাধীনতা যুদ্ধকালের তথ্য। শুধু গর্জ নয় গ্রন্থটির এই অংশে এম, আর আখতারের দক্ষ হাতে এক একটি ঐতিহাসিক চরিত্র যেন সজীব হয়ে উঠেছে। কলমের কয়েকটি আঁচড়ে মওলানা ভাসানী, তাজউদ্দীন এবং অন্যান্য চরিত্রগুলো সেভাবে ফুটে উঠেছে তা শুধু তার সত্য নিষ্ঠারই পরিচয় বহন করেনা, চরিত্র বর্ণনার এক দক্ষ কারিগরেরও পরিচয় প্রদান করে। গ্রন্থটির ১২৭ পৃষ্ঠায় স্বাধীনতা যুদ্ধে তাজউদ্দীনের অবদান সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য যেমন সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও জোরালো, ঠিক তেমনি স্বাধীন বাংলাদেশে মন্ত্রিসভা থেকে তাজউদ্দীনের বিদায় সম্পর্কে তার মন্তব্য "মনে হলো বঙ্গবন্ধুর কোমর থেকে শানিত তরবারী অদৃশ্য হলো," চমৎকারিত্বের দাবী রাখে। মুজিব নগরে গঠিত সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান মওলানা ভাসানীর অবদান প্রসংগে বলতে গিয়ে শুধু মাত্র তার দুটো বিবৃতি দিয়েই তিনি মওলানা ভাসানীর সেদিনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সবাইকে উপলব্ধ করিয়েছেন। এছাড়াও বইটির বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাঁর কথা, বঙ্গবন্ধুর সংগে তাঁর সম্পর্কের কথা। এম, আর আখতার মুকুল বলতে চেয়েছেন প্রয়োজনবোধে এই দুই মহান নেতা একজন আর একজনের সম্পুরক হয়েছেন, এদুজনে মিলেই বাংলাদেশের গণ আন্দোলনের মূল শ্রোতধারা, এই দুয়ের মিলনেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। অন্যরা সহায়ক শক্তি। গ্রন্থকারের এই মূল্যায়ন বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু এর সত্যতা যাচাইয়েরও অপেক্ষা রাখে না।

কবিবন্ধু ফয়েজ আহমদের চরিত্র চিত্রণে লেখক যে রসের সৃষ্টি করেছেন, তা আলোচনা করতে গিয়ে রসভঙ্গ করতে চাই না। গ্রন্থের ১৫২ পৃষ্ঠা পড়লেই এর অপূর্ব স্বাদ পাওয়া যাবে।

গ্রন্থের এই অংশের ৪১, ৪২, ৪৭, ৪৯, ৬৩ এবং ৭০ নং অধ্যায়ে আছে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের কিছু মূল্যবান দলিল। বিশেষ করে রাও ফরমান আলীর নিজ হাতে লেখা বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনক্সা (পৃঃ ৩১৬)।

শেষাংশ বা পরিশিষ্ট শুরু হয়েছে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবের জবানবন্দী' এই দলিল দিয়ে। এই অংশে যেমন রয়েছে কিছু দুর্লভ ছবি এবং ম্যাপ তেমনি রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দলিল; এই অংশে ২৫শে মার্চ বাংগালী হত্যার নীল নক্সা' শীর্ষক 'অপারেশন সার্চ লাইট' দলিলটি পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর ঘৃণ্য রক্ত লোলুপতার পরিচয়বহনকারী একটি মূল্যবান দলিল। (আজও যাঁরা পাকিস্তান প্রেমে মাতোয়ারা তাদের এই অংশটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি। গ্রন্থ পৃষ্ঠা ঃ ৩২৭)। গ্রন্থের এই অংশেই গ্রন্থকার বামপন্থী আন্দোলন এবং বামপন্থীদের তৎকালীন ভূমিকা সম্পর্কে তার বিশ্লেষণ দিয়েছেন। গ্রন্থকারের বিশ্লেষণ যদি কেউ গ্রহণ কবতে না পারেন তবে আমরা আশা করবো চায়ের আসরে গাল মন্দ না দিয়ে বামপন্থী পাঠকেরা লিখিতভাবে তা খন্ডন করার চেষ্টা করবেন। তাতে লেখকের ভুল ধরা পড়বার সংগে সংগে নিজেদের ত্রুটিগুলিও চোখে পড়বে (যদি কেউ তা প্রকাশ্যে স্বীকার করতে রাজী নাও থাকেন)।

আমি বিজয় দেখেছি গ্রন্থে কিছু ভুল ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়; ঘটনার বিশ্লেষনের সংগে সকলে একমত নাও হতে পারেন। তবু বলবো বইটি আমাদের সবাইর পড়া দরকার এবং পরিবারের সদস্যদের পড়ানো উচিৎ। কারণ তৃতীয় বিশ্বের এই দরিদ্রতম দেশের অধিবাসীদেরও যে একটা গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আছে তা সবারই জানা উচিৎ।

যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবানী।
সে সবার কিবা রীতি নির্নয় না জানি॥
মাতা-পিতামহ ক্রমে বঙ্গেতে বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মান হিত অতি॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশে না যায়॥

অবিকৃত ইতিহাস

মহান ভাষা আন্দোলনের ৩৩তম বার্ষিকীতে আমরা দু'জন 'বাহান্নর ভাষা আন্দোলন' নামে এই বইখানা সম্পাদনা করতে পেরে গর্ব অনুভব করছি। এমন এক সময়ে এই বই প্রকাশিত হল যখন ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কিত বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করার সময় বেশ কিছুটা বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর পিছনে মোটামুটিভাবে দু'টো কারণ বিদ্যমান। প্রথমতঃ যাঁরা এ পর্যন্ত এ ধরনের বই কিংবা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখেছেন বা লিখছেন তাঁদের অধিকাংশই কোনও না কোনও রাজনৈতিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী এবং সেই কারণে সংগতভাবেই তাঁদের লেখায় নিরপেক্ষতার বদলে অনেক সময়েই দলীয় দৃষ্টিভঙ্গীটাই প্রধান হয়ে ওঠে। যার ফলে প্রকৃত ইতিহাস হয়ে পড়ে গৌণ। দ্বিতীয়তঃ আর এক ধরনের লেখক রয়েছেন, যাঁরা ভাষা আন্দোলনের সংগে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন না। ঐদের আন্তরিকতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেও বলা যায় যে, স্বাভাবিকভাবেই ঐদের লেখনীতে ভাষা আন্দোলনের অবিকৃত ইতিহাস পাওয়া সম্ভব নয়।

অথচ আমাদের বাঙালি জাতির ইতিহাসে বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী ও অপরিসীম। ভাষা আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে উত্তরণ ঘটেছে। আমাদের সাংস্কৃতিক যুদ্ধের বহিঃপ্রকাশেই স্বাধীনতার যুদ্ধ। ভাষা আন্দোলন থেকেই আমাদের স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন এবং সব শেষে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। সবই এক সূত্রে গাঁথা।

এই প্রেক্ষাপটে উত্তরসূরীদের কাছে অন্ততঃ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকে অবিকৃত অবস্থায় উপস্থাপনা করার জন্যই আমাদের এই প্রয়াস। এই সংকলনে যাঁদের প্রতিবেদন ও লেখা ছাপা হয়েছে তাঁরা সবাই বাহান্নতে ছিলেন তরুণ যুবক এবং ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিত্ব।

ভাষা আন্দোলনের অবিকৃত ইতিহাসকে উপস্থাপনা করা আর তৎকালীন ছাত্র ও যুবসমাজের মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন সংগ্রামী মনমানসিকতা বোঝাবার জন্য এই বই আমরা সম্পাদনা করেছি।

পরিশেষে বইটির সার্বিক তত্ত্বাবধায়নের জন্য কবি বেলাল চৌধুরীকে এবং প্রকাশের জন্য হাক্কানী পাবলিশার্স-এর স্বত্বাধিকারী গোলাম মুস্তফাকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ। প্রচ্ছদ পরিকল্পনার কৃতিত্ব শিল্পী মুনীর খান-এর।

গাজীউল হক
এম আর আখতার মুকুল

৬ই ফাল্গুন ১৩৯১ রমনা ঢাকা

এম আর আখতার মুকুল প্রণীত বই

পনী এক্সপ্রেস (অনুবাদ)
রূপালী বাতাস (১ম খণ্ড)
রূপালী বাতাস সোনালী আকাশ (উভয় খণ্ড একত্রে)
মুজিবের রক্ত লাল
আমি বিজয় দেখেছি
লণ্ডনে ছক্কু মিয়া (যন্ত্রস্থ)

উৎসর্গ

বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে যাঁরা শহীদ হয়েছেন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা দেশমাতৃকার শৃংখল মোচনের জন্য আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

হাক্কানী পাবলিশার্স
১৪১ ঢাকা ষ্টেডিয়াম
প্রথম মুদ্রণ ঃ ফাল্গুন ১৩৯১
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অঙ্গসজ্জা
মুনীর খান হেম রায়
ফটো-কম্পোজ এবং মুদ্রণ
জেনিথ প্যাকেজেস লিমিটেড ঢাকা
প্রকাশক
হাক্কানী পাবলিশার্স
১৪১ ঢাকা ষ্টেডিয়াম রমনা ঢাকা
মূল্য ঃ ৪০ টাকা ২০ রূপী ভারতে ৬ মার্কিন ডলার সডাক

সূচী

মহান একুশের গান
অমর একুশের স্কেচ
আমার হৃদয়ের অনুভূতি
মাতৃভাষা-চেতনা
দুর্বার হল সেই আন্দোলন
ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচারণ
ভাষা আন্দোলনের পটভূমি এবং
রক্তাক্ত একুশের ঘটনাপঞ্জি
বাঙালীর আত্মপরিচয় নির্ণয়
এক নজরে বাঙলা বিবর্তনের কাল-সূচী
একুশের কয়েকটি সংগ্রামী কবিতা
এবার আমরা তোমার
কাল রাতে উঠেছিল ঝড়
কাঁপিয়ে দেবে এই পৃথিবীর আকাশ-বাতাশ
মাগো ওরা বলে
ধানের গুচ্ছে রক্ত জমেছে
স্মৃতির মিনার

বিক্ষুব্ধ আত্মাঃ গীতিকার আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী' গান এবং শিল্পী মূতর্জা বশীরের একুশের স্কেচ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক দলিলের অবিস্মরণীয় সমন্বয়

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্ত রাঙানো ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি ।।

জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কালবোশেখীরা
শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,

দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবী
দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি ?
না, না, না, না খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী ।।

সেদিনো এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে
রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে;
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলকানন্দা যেনো,
এমন সময় ঝড় এলো এক, ঝড় এলো ক্ষ্যাপা বুনো।
সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা,
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবীকে রোখে

ওদের ঘৃণা পদাঘাত এই বাংলার বুকে
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী ।।

তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারী
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী
আমার শহীদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালবো ফেব্রুয়ারী
একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী ।

"১৯৫২-র আন্দোলন ছিলো অধিকার প্রতিষ্ঠার"

... ... ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ যখন করাচীতে গণপরিষদে এ'মর্মে প্রস্তাব পাশ করা হলো যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, তখন থেকেই বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত। তখন কুমিল্লার মিঃ ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত একমাত্র এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। আমি অবাক হয়ে যাই, এ সময় আমাদের বাংগালী মুসলিম নেতৃবৃন্দ কি করছিলেন ?

১৯৫২ সালের আন্দোলন কেবলমাত্র ভাষা আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো না, এ আন্দোলন ছিলো সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ... ...

... ... আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথেষ্ট রক্ত দিয়েছি। আর আমরা কেবলমাত্র শহীদ হবার জন্য জীবন উৎসর্গ করবো না—এবার আমরা 'গাজী' (বিজয়ী) হবো। সাত কোটি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলনের শহীদানদের নামে শপথ করছি যে, আমি নিজের শরীরের শেষ রক্তবিন্দু উৎসর্গ করবো।

বাংলাদেশের জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্তের মোকাবেলায় আপনারা যাতে কাপুরুষ না হয়ে পড়েন, সেজন্য শহীদদের আত্মা ভিক্ষা চাইছে আপনারা সাহসী হোন। ভাষা আন্দোলনের সময় যেসব ষড়যন্ত্রকারীরা হত্যার জন্য দায়ী ছিলেন, তারা আজও পর্যন্ত সক্রিয় রয়েছেন। অতীতে ষড়যন্ত্র হয়েছে এবং এখনও তা' অব্যাহত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও ষড়যন্ত্র হবে। ষড়যন্ত্রকারীদের একথা উপলব্ধি করা দরকার যে, ১৯৫২ সালের বাংলাদেশ ও ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ হয়ে গেছে ... ...

বাংগালীরা এখনও শহীদ হচ্ছে। তবে সব সময়ে বন্দুকের গুলিতে নয়। বাংগালীরা অনাহারে মারা যাচ্ছে। আমরা কারো প্রতি অন্যায় করতে চাইনা। কিন্তু একই সংগে আমরা আর আমাদের উপর শোষণ বরদাশ্‌ত করবো না। যদি আমাদের অধিকার আদায়ের সময় শাসকগোষ্ঠী বাধার সৃষ্টি করে, তাহলে আমরা তা' প্রতিহত করবো ... ...

আমি সামনে ভয়ংকর দিন দেখতে পাচ্ছি। আমি সব সময়ে আপনাদের সংগে নাও থাকতে পারি। মরণের জন্যই মানুষ বেঁচে থাকে। জীবনে বেঁচে থাকাটাই একটা দুর্ঘটনা মাত্র। আমি জানিনা আবার কখন আপনাদের সংগে আমার দেখা হবে। কিন্তু আপনাদের কাছে আমার দাবী রইলো। বাংলাদেশের জনসাধারণ যেনো তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তা' আপনারা নিশ্চিত করবেন। শহীদদের রক্ত যেন বৃথা না যায়।

শহীদ স্মৃতি অমর হোক। জয় বাংলা।

[১৯৭১ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিটে শহীদ মিনারের পাদদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি]

আমার হৃদয়ের অনুভূতি

মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ

[১৯৫২ সালে মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক পরিষদে পাবনা থেকে নির্বাচিত মুসলিম লীগ দলীয় পরিষদ সদস্য। তৎকালীন ক্ষমতাশীন মুসলিম লীগ দলের গণবিরোধী কার্যকলাপে তিনি বেশ বিরূপ ছিলেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের নির্মম গুলি বর্ষণের সংবাদে তিনি আক্রোশে ফেটে পড়লেন। এই প্রেক্ষাপটে মওলানা সাহেব সেদিন পরিষদে যে ঐতিহাসিক বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন, তারই নামকরণ করা হয়েছে 'আমার হৃদয়ের অনুভূতি'। বক্তব্য প্রদানের পর গুলি বর্ষণ ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে বিরোধী দলীয় সদস্যদের সংগে তিনি একযোগে পরিষদ কক্ষ পরিত্যাগ করেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারী পুলিশ মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে। —সম্পাদকবৃন্দ]

Maulana Abdur Rashid Tarkabagish:

জনাব স্পীকার সাহেব, প্রশ্নোত্তরের পূর্বে আমি আপনার কাছে একটা নিবেদন করতে চাই। যখন দেশের ছাত্ররা, যারা আমাদের ভাবী আশা-ভরসার স্থল, পুলিশের গুলির আঘাতে জীবন লীলা সাঙ্গ করছে, সেই সময় আমরা এখানে বসে সভা করতে চাই না। প্রথমে enquiry তারপর হাউস চলবে। . . . .

Mr. Speaker: Order, Order. I hope you will proceed according to the rules of business of the House:

Maulana Abdur Rashid Tarkabagish:

Leader of the House

Maulana Abdur Rashid Tarkabagish:

Leader of the house আগে গিয়ে দেখে এসে বিবৃতি দেবেন তা না হলে আমরা House- চলতে দেব না।
সেখানে কি অবস্থা হয়েছে আগে জানতে চাই। · ·

Mr. Speaker: I hope, honourable members will proceed in a regular way, if the members want to hear the leader of the House in the matter, I would ask him if he has got anything to say.

Maulana Abdur Rashid Tarkabagish:

আপনার order বুঝি না আপনার order মানব না। · · · · · · · ·
Leader of the House প্রথমে গিয়ে দেখে এসে বিবৃতি দেবেন তারপর Assembly বসবে। · · · · · ·

Mr. Speaker: Order, Order, you have no right to disobey the chair. Please take your seat.

Maulana Abdur Rashid Tarkabagish.:

Leader of th House আগে গিয়ে দেখে এসে বিবৃতি দিবেন তারপর House- -এ কাজ চলবে। ·

Mr. Speaker: Order, Order, Do you mean to say that you will not allow anybody else to speak? You are obstructing the proceedings of the House.

Maulana Abdur Rashid Tarkabagish:

leader of the House enquiry করে আসুন, তারপর House বসবে তার পূর্বে নয়।

Mr. Speaker Order, Order. Mr. Tarkabagish I am very sorry. I may be compelled to take action under rule 16(2) of the East Bengal Legislative Assembly Procedure rules, if you do not obey the chair.

মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ

যে কোন action নিতে পারেন। আমাদের দাবী দেখে এসে বলুন পরিস্থিতি কি ?

Mr. Speaker: Order, Order, Please take your seat. I request you not to prevent others from speaking .. .. ..
(The House was then adjourned for fifteen minutes).

(after adjourment)

Maulana Abdur Rashid Tarkabagish:

যখন আমাদের বক্ষের মানিক, আমাদের রাষ্ট্রের ভাবী নেতা ৬ জন ছাত্র রক্ত শয্যায় শায়িত তখন আমরা পাখার নিচে বসে হাওয়া খাব এ আমি বরদাস্ত করতে পারি না।

আমি জালেমের এই জুলুমের প্রতিবাদে পরিষদ গৃহ পরিত্যাগ করছি এবং মানবতার দোহাই দিয়া আপনার মধ্যতায় সকল মেম্বারের কাছে পরিষদ গৃহত্যাগে আবেদন জানাচ্ছি। · · · · · · · · ·

রক্ত আখর, ১৯৫৭

একক কোন নেতৃত্বে পরিচালিত হয়নি

হাসান হাফিজুর রহমান

সে সময় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন থাকলেও বাংলা ভাষার প্রশ্নে কোনও সংগঠনই দ্বিমত পোষণ করেনি। উত্তেজনা তুমুল ছিল এবং ছাত্রদের জঙ্গী মনোভাব ছিল।

বিভিন্ন সংগঠনের যে সিদ্ধান্তই থাক না কেন চরম আন্দোলনের মুখে সব সিদ্ধান্তই ভেস্তে গিয়েছিল। সে সময়কার আন্দোলন বিশেষ কোনও নেতৃত্বে না হোক সাধারণ-ছাত্র সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। আসলে ২১শে তারিখের বেলা ১১টার পর এ আন্দোলন নেতৃবর্গের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল।

'৫২-র ভাষা আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের সকলেই রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন না। সাধারণ ছাত্ররা বিভিন্ন মতাবলম্বী হওয়া সত্বেও ভাষার প্রশ্নে একটি প্ল্যাটফর্মে এসে সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল।

ভাষা আন্দোলনকে সামনে রেখে কোনও রাজনৈতিক দল কি ফায়দা লুটতে চেয়েছে, সাধারণ ছাত্ররা অর্থাৎ আমরা ঠিক তখন বুঝতে পারিনি। তবে, আন্দোলনের গতি সারা দেশে সাধারণ ছাত্র ও মানুষের আবেগে ও সক্রিয়তায় এত তীব্র ছিল যে, তা একক কোনও নেতৃত্বে পরিচালিত হয়নি।

'৫২ সাল থেকে শুরু করে '৫৪ সালের ইলেকশন পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের জোয়ার খুব তীব্র ছিল। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আমি একটা সংকলন বের করি ১৯৫৩ সালের মার্চে। ২১ দিন পর মুসলিম লীগ সরকার সংকলনটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতিটি সভায় এ সংকলনটির উপর থেকে সরকারী বিধিনিষেধ তুলে নেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সাহিত্যিকদের তরফ থেকে তখন বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ছাত্রদের তরফ থেকেও বহু প্রচারপত্র সে সময় প্রকাশিত হয়। '৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের সকল দলই '৫২ সালের রাজনৈতিক চেতনাকে পুরোপুরি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। এটা বেশ পরিষ্কার ছিল সবার কাছে। ভাষা আন্দোলনের এই ইমেজকে কোনও দলই হাতছাড়া করতে চাননি। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের দাবী প্রতিটি স্তরেই উচ্চারিত হয়েছে।

[বাংলা একাডেমীর একুশের সংকলন '৮০—থেকে উদ্ধৃতি]

একুশের স্মৃতিচারণ

গাজীউল হক

১৯৪৭ থেকে '৭৯ সাল। বহুগুলো বছর পার হয়ে গেছে। এ বছরগুলোতে ঘটনা ঘটে গেছে অনেক। এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অনেক বন্ধুর সাথে রাজপথে দেখা হয়েছে। কাজ করেছি একসাথে, এক মিছিল ছিলাম। সব মুখগুলো আজ আর স্মরণে আসে না। ধীরে ধীরে স্মৃতির পাতা থেকে সরে যাচ্ছে। সব নামগুলো আর বহু চেষ্টা করেও মনে আনতে পারিনা। সুতরাং আজকে এ স্মৃতিচারণকালে স্বাভাবাবিকভাবে অনেক বন্ধুর নাম বাদ পড়ে যাবে এবং স্বাভাবিকভাবেই অনেক সংগ্রামী সাথীর নাম লিপিবদ্ধ করতে পারবো না। যদিও এটি আমার অনিচ্ছাজনিত ত্রুটি, তবুও আমার মনে একটা অপরাধবোধ ক্রিয়া করছে এজন্যে যে, যখন সব মুখগুলো উজ্জ্বল ছিল, যখন সবগুলো ঘটনা স্মৃতির পাতায় জ্বল জ্বল করতো তখন কেন এ স্মৃতির কথাগুলো লিপিবদ্ধ করলাম না। এ অপরাধবোধই আজ এ মুহূর্তে এক্ষনে আমাকে বার বার পীড়া দিচ্ছে। তাছাড়া যখন দেখি যে সাথী বন্ধুরা আজ এক একজন এক এক জায়গাতে বিরাজ করছেন - এক একজন এক এক কোটিতে অবস্থান করছেন তখন স্বাভাবতই স্মৃতিকথা বলতে গিয়ে একটু সংকোচবোধ জাগে। কারণ, কে কিভাবে কথাগুলো গ্রহণ

করবেন ! কোনও রাজনৈতিক দলের সাথে আজ আমার সরাসরি যোগাযোগ নেই । সুতরাং এই মুহূর্তে আমি যখন আমার স্মৃতিকথাগুলো বলতে যাচ্ছি স্বাভাবিকভাবেই আমি চেষ্টা করবো যে যা করেছিলেন এবং তিনি এখন যেখানেই থাকুন না কেন, তার সেই অতীত দিনের কর্মকান্ডগুলো সঠিকভাবে বলার জন্যে । যদি সেটি কারও পক্ষে যায় ভাল—যদি কারো বিরুদ্ধে যায় তবে কিছু করার নেই । কেন না ইতিহাস ইতিহাসই হওয়া উচিত ।

ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে বলতে গিয়ে যদি শুধু ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন দিনের ঘটনাগুলোই বলা হয়, তাহলে সেটি হবে একটি আংশিক বিবরণ । কারণ ভাষা আন্দোলন যেমন এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে, এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে, পরিপুষ্ট করেছে, ঠিক তেমনি এ দেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেযে সমস্ত গণতান্ত্রিক সংগঠন জন্ম নিয়েছিলো—সে সব সংগঠনগুলোও ভাষার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সাহায্য করেছে । এদেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং এদেশের গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলোকে বাদ দিয়ে যেমন ভাষা আন্দোলনের কথা চিন্তা করা যায় না, তেমনি ভাষা আন্দোলনকে বাদ দিয়ে এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কথাও চিন্তা করা যায় না । সুতরাং ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি মন্থন করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত, তার ক্রমবিকাশ এবং বিভিন্ন গণসংগঠনগুলোর ভূমিকা উল্লেখ বাঞ্ছনীয় ।

যদিও এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা খুঁজতে গিয়ে আমরা ভাষা আন্দোলনকে আবিষ্কার করি, তবুও এ কথাটুকু স্বীকার করতে কোনও রাজনীতিকের বা কারো লজ্জিত হওয়ার কথা নয় যে, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার এ দাবীটুকু প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল কোনও রাজনীতিবিদের কণ্ঠে নয়, এ দাবীটুকু প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল অথবা বলতে গেলে এ দাবী যাঁর লেখনী থেকে উৎসারিত হয়েছিল তিনি একজন মহান শিক্ষাবিদ এবং মহান সংস্কৃতিবিদ । আমি এ উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর কথাই বলছি । তিনি শুধু শিক্ষাবিদ বা সংস্কৃতিবিদ ছিলেন না, আমি বলতে চাই, তিনি ছিলেন এ উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ । যেমন পাকিস্তান আন্দোলনের চিন্তাবিদ হিসেবে ডক্টর ইকবালকে চিত্রায়িত করা হয় ঠিক তেমনি আজ এ মুহূর্তে আমি যদি বলি এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম চিন্তাবিদ ছিলেন ডক্টর শহীদুল্লাহ, আমার মনে হয় তাহলে এতটুকুও ভুল বলা হবে না ।

১৯৪৭ সালে জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর জিয়াউদ্দীন আহমদ যখন উর্দূকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা স্বপক্ষে ওকালতি শুরু করেন ঠিক তখুনি তাঁর প্রতিবাদ করেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ । তিনি তাঁর একটি নিবন্ধে (যা ১৯৪৭ সালে জুলাই মাসেই 'আজাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল) বলেছিলেন যে, পূর্ব-পাকিস্তানে শিক্ষার ভাষা, অফিস-আদালতের ভাষা বাংলা হবে । এবং রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবেও তিনি বাংলার দাবীকে অগ্রগণ্য বলে উল্লেখ করেছিলেন । যদি এর পরেও অন্য কোনও ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার প্রশ্ন আসে, শুধুমাত্র তা হলেই উর্দূর কথা চিন্তা করা যেতে পারে । ডক্টর শহীদুল্লাহর এ বক্তব্য তখন এ দেশের শিক্ষিত এবং বুদ্ধিজীবী মহলে ভাষা সম্পর্কে প্রথম আলোড়নের সৃষ্টি করে ।

ভারত বিভাগ হলো, জন্ম হলো পাকিস্তানের । পাকিস্তানের জন্মের কিছুদিন পরেই তদানীন্তন নিখিল বংগীয় মুসলিম ছাত্রলীগের মধ্যে যে সমস্ত বামপন্থী ছাত্র ছিলেন এবং অন্য যে সমস্ত বামপন্থী সংগঠনের ছাত্র ছিলেন তারা পূর্ব-পাকিস্তানে একটি গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন আহ্বান করেন । ১৯৪৭ সালের ৬ই এবং ৭ই সেপ্টেম্বর এ সম্মেলনটি ঢাকাতেই অনুষ্ঠিত হয় । ঢাকা

মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব ভাইস চেয়ারম্যান খান সাহেব আবুল হাসনাতের বাসাতেই এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে যাঁরা উদ্যোক্তা ছিলেন তাঁরা হলেন জনাব শহীদুল্লাহ কায়সার, জনাব শামসুল হক (আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক), জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা, জনাব আতাউর রহমান (রাজশাহী) মরহুম আজিজ আহমদ, জনাব অলি আহাদ, জনাব তাসাদ্দুক হোসেন, জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, জনাব শামসুদ্দীন আহমদ, মিসেস হাজেরা মাহমুদ প্রমুখ। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, ৬ই ও ৭ই সেপ্টেম্বরের পূর্বে ৩১শে আগষ্ট ফজলুল হক মুসলিম হলে একটি ছাত্রকর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্যোগ নিয়েছিলেন, জনাব নঈমুদ্দীন, জনাব আজিজ আহমদ, জনাব তোহায়া, অলি আহাদ, তাজউদ্দিন আহমদ প্রমুখ। কিন্তু দক্ষিণ পন্থী কিছু ছাত্র ও গুন্ডাদের আক্রমণে ঐ ছাত্রসভা শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। ফলে, কোনও সঠিক সিদ্ধান্তও নেয়া সম্ভব হয়নি। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিলো ছাত্রদের একটি অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গঠন করা। কিন্তু ৩১শে আগষ্টের দুর্ঘটনার জন্যে সেদিন ঐ সংগঠন বাস্তবে রূপ লাভ করতে পারেনি। ফলে বলা যেতে পারে, ৬ ও ৭ই সেপ্টেম্বরে যে গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন হয় সেই কর্মী সম্মেলনে পাকিস্তানে সর্বপ্রথম একটি অসম্প্রদায়িক যুব প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে। এ গণতান্ত্রিক সম্মেলনে যে যুব সংগঠন জন্মলাভ করে তার নামকরণ হলো 'পূর্ব-পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক ইয়থ লীগ বা 'পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুব লীগ'। গণতান্ত্রিক যুবলীগের ঘোষণাপত্রে বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের আইন-আদালতের ভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যমে ও শিক্ষার বাহন হিসেবে গ্রহণ করার জন্য দাবী করা হয়। কিন্তু সেদিনও গণতান্ত্রিক যুব সম্মেলনে সমস্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ করার জন্যে কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বলা হয়েছিলো যে, গণ-পরিষদ এ সম্পর্কে বিবেচন করবেন।

১৯৪৭-র ১৫ই সেপ্টেম্বর 'তমদ্দুন মজলিসের'র পক্ষ থেকে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দূ ? এ শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এতে লিখেছিলেন ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন এবং আবুল মনসুর আহমদ। পুস্তিকাটির ভূমিকা লিখতে গিয়ে তমদ্দুন মজলিসের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবুল কাশেম বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সরাসরি দাবী জানিয়েছিলেন। এবং জনাব আবুল মনসুর আহমেদ ও ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে নিবন্ধ লিখেছিলেন। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী সম্বলিত এ পুস্তিকাটি সারা দেশে প্রচারিত হয়।

এদিকে গণতান্ত্রিক যুবলীগের কাজ ঢাকায় কিছুটা স্তিমিত হয়ে যায়। জনাব শামসুল হক কয়েকটি বুলেটিন প্রকাশ করিয়েই কর্তব্য সম্পাদন করেন। এর সংগঠকরা সমগ্র দেশে সাংগঠনিক তৎপরতা অব্যাহত রাখতে পারেননি। গণতান্ত্রিক যুবলীগ ১৯৪৯-র প্রথমার্ধ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে টিকে ছিল। সেখানে যুবলীগকে সাংগঠনিক রূপ দেবার জোর প্রচেষ্টা চলে।

১৯৪৭ সালের ৬ই এবং ৭ই সেপ্টেম্বরের গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনে চট্টগ্রাম জেলা ছাড়া আর সকল জেলার প্রতিনিধিই উপস্থিত ছিলেন। বেশীর ভাগ প্রতিনিধি এসেছিলেন উত্তরবঙ্গের রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, ও পাবনা থেকে। দিনাজপুর থেকে প্রাক্তন ছাত্রনেতা দবিরুল ইসলামের নেতৃত্বে, রংপুর থেকে ছাত্রনেতা পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী জনাব মতিয়ুর রহমানের নেতৃত্বে, রাজশাহী থেকে জনাব আতাউর রহমানের নেতৃত্বে, বগুড়া থেকে অধ্যাপক আবুল খায়ের-এর নেতৃত্বে উল্লেখযোগ্য কর্মী এ সম্মেলনে যোগদান করেন। আমার যতদূর মনে পড়ে, দিনাজপুর, থেকে এসেছিলেন অন্যান্যদের মধ্যে জনাব দবিরুল ইসলাম.

বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডক্টর মুস্তফানূরউলইসলাম, এম আর আখতার (মুকুল) (পরবর্তীতে 'চরমপত্রকার' হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন), জনাব আব্দুর রহমান প্রমুখ, রাজশাহী থেকে জনাব আতাউর রহমান, জনাব মোহাম্মদ সুলতান, জনাব একরামুল হক, জনাব গোলাম রহমান (পরবর্তীকালে ইনি দিনাজপুরে বিশিষ্ট আইনজীবী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন)। বগুড়া থেকে আমরা যারা এসেছিলাম তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক আবুল খায়ের, অধ্যাপক গোলাম রসুল, অধ্যাপক প্রীতিশ দত্ত, কবি আতাউর রহমান, শ্যামাপদ সেন জনাব মযহারুল ইসলাম, জনাব আমজাদ হোসেন, জনাব সৈয়দ কেরামত আলী (মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক নিহত), জনাব আব্দুর রশীদ প্রমুখ।

আমরা উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধিরা ঠিক করলাম পরবর্তীতে উত্তরবঙ্গে একটি আঞ্চলিক সম্মেলন আহ্বান করবো। সম্মেলনের তারিখ নির্ধারিত হয়েছিলো ১৯৪৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর কারণে সম্মেলন দু'দিন পিছিয়ে যায় এবং ২রা ফেব্রুয়ারী রাজশাহীতে গণতান্ত্রিক যুবলীগের আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন জনাব একরামুল হক। সে সম্মেলনেও বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী সম্বলিত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলন শেষে ভুবনমোহন পার্কে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। সে সভায় ভিয়েৎনামের প্রতিনিধি মাই থি চাউ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আর ছিলেন পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জনাব নঈমুদ্দীন আহমদ। মাই থি চাউ-এর বক্তৃতার পর জনাব নঈমুদ্দীন আহমদ যখন বক্তৃতা করছিলেন তখন নিখিল পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ সমর্থক কিছু ছাত্র হকি ষ্টিক নিয়ে জনাব নঈমুদ্দীনকে আক্রমণ করে এবং সভা পন্ড করে দেয়। সেদিন অবশ্য যাঁরা সভা পন্ড করেছিলেন তাঁদের অনেকেই পরবর্তীকালে এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন। তাই দেখি, যাঁরা একদিন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন আজ তাঁদের অনেকেই দূরে সরে গেছেন, অন্যদিকে একদিন যাঁরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন আজ তাঁদের অনেকেই এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোভাগে এগিয়ে এসেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। ১৯৪৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর 'মর্নিং নিউজ' কাগজে একটি বিশেষ সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ সংবাদে বলা হয় যে, করাচীতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। সংবাদটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐদিন বেলা দুটোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে অধ্যাপক আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে একটি ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন মুনীর চৌধুরী, জনাব আব্দুর রহমান চৌধুরী (বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি), কল্যাণ দাসগুপ্ত, এ কে এম আহসান প্রমুখ। এ সভায় প্রস্তাব পাঠ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ফরিদ আহমদ (পরবর্তীতে তিনি জাতীয় পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন)। ফরিদ আহমদ তার প্রস্তাবে পরিষ্কারভাবে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার দাবী উত্থাপন করেন। সেদিনের ছাত্রসভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ দাবী গৃহীত হয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে, সভাশেষে ছাত্রদের একটি বিরাট মিছিল তদানীন্তন প্রাদেশিক কৃষিমন্ত্রী সৈয়দ আফজালের বাসভবনে যায় এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করে। মিছিলটি জনাব নূরুল আমিন এবং জনাব খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের বাসভবনেও যায় এবং মন্ত্রীদ্বয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। ছাত্র প্রতিনিধিরা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা সম্পর্কে তাঁদের মতামত

চান, তাদের উপর চাপ দেন এবং এ দাবীকে সমর্থন করবেন কি না সে সম্পর্কে জানতে চান। সেদিন ছাত্রদের আন্দোলনের চাপের মুখে জনাব সৈয়দ আফজল, জনাব নূরুল আমিন এবং খাজা নাজিমুদ্দীন স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, তাঁরা গণপরিষদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীকে সমর্থন করবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ছাত্র প্রতিনিধি দল সেদিন জনাব হামিদুল হক চৌধুরীর সঙ্গেও দেখা করেছিলেন; কিন্তু তাঁর সঙ্গে ছাত্র প্রতিনিধিদের বেশ কথা কাটাকাটি হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ছাত্রদের দাবী সমর্থন না করার পক্ষে মনোভাব প্রকাশ করেন।

১২ই ডিসেম্বর কয়েকটি বাস এবং ট্রাকে করে ছাত্র নামধারী একদল গুন্ডা পলাশী ব্যারাক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হোস্টেলে হামলা চালায়। এ ঘটনার খবর সারা ঢাকা শহরে বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে হয়ে পড়ে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র এবং পলাশী ব্যারাক ইত্যাদি এলাকার কর্মচারী এবং জনসাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়। সেখান থেকে একটা বিরাট মিছিল শিক্ষামন্ত্রী আব্দুল হামিদের বাসভবন ঘেরাও করে। জনাব আব্দুল হামিদ লুঙ্গি পরা অবস্থায় ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং মিছিলে যাঁরা নেতৃবৃন্দ ছিলেন তাঁরা তাঁর কাছে গুন্ডামী বন্ধের দাবী জানান এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রশ্নে স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করেন—কেন মনিঅর্ডার ফর্মে এবং ডাকটিকেটে উর্দুর সঙ্গে বাংলাকে রাখা হয়নি? জনতা মন্ত্রী আব্দুল হামিদকে নিয়ে সেক্রেটারিয়েটের দিকে মিছিল করে এগিয়ে যায় এবং সেক্রেটারিয়েটের ভেতরে ঢুকে পড়ে। সেখানে কৃষিমন্ত্রী সৈয়দ আফজল-এর সঙ্গে ছাত্র প্রতিনিধিরা দেখা করে। এ সময় এই জঙ্গী মিছিল জনাব আফজল এবং জনাব আব্দুল হামিদের কাছ থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি নেয় যে, তাঁরা বাংলা ভাষার দাবীকে সমর্থন করবেন। ১৩ই ডিসেম্বর সেক্রেটারিয়েট কর্মচারীরা তাদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার প্রেক্ষিতে হরতাল পালন করে। এ দাবী দাওয়াগুলোর মধ্যে একটা দাবী ছিল বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী।

ইতিপূর্বে যতদূর মনে পড়ে, '৪৭ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি 'মর্নিং নিউজ'-এর একটি সম্পাদকীয়তে যাঁরা বাংলা ভাষার পক্ষে আন্দোলন করছিলেন তাঁদের নিন্দা করা হয় এবং উর্দুর পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করা হয়।

'মর্নিং নিউজে'র ঐ সম্পাদকীয়তে পরিষ্কারভাবে এই কথাটাই বলার চেষ্টা করা হয় যে, পাকিস্তানের শত্রুদের দ্বারা পরিচালিত হয়েই ছাত্ররা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে আন্দোলন করছে। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা না করলে পাকিস্তানের স্থায়িত্ব বিনষ্ট—একথাটা থেকে তখনকার ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং প্রগতিশীল ব্যক্তি যাঁরা ছিলেন তাঁদের মনে এ ধারণা জন্মায় যে, উর্দুকে সুকৌশলে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্ট হচ্ছে। এ অবস্থায় তাঁরা মনে করেন যে রাষ্ট্রভাষার এ সংগ্রামটি একটি দীর্ঘকালের সংগ্রাম হতে পারে, সেজন্যে সংগ্রামকে একটি সাংগঠনিক রূপ দেয়ার চেষ্টা শুরু হয়।

১৯৪৭ সালে ডিসেম্বরের শেষ দিকে পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে রশিদ বিল্ডিং নামে যে বিল্ডিং ছিল সেখানে একটি কক্ষে (তমদ্দুন মজলিসের অফিসে) একটি সভা হয়। প্রতিনিধি স্থানীয় ছাত্র, প্রফেসর এবং বুদ্ধিজীবীরা এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে মুসলিম ছাত্রলীগের কিছু নেতৃস্থানীয় ছাত্র, গণতান্ত্রিক যুবলীগের কর্মী এবং তমদ্দুন মজলিসের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এটিই সর্বপ্রথম সংগ্রাম পরিষদ। এই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক নিযুক্ত হন অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া। তিনি তমদ্দুন মজলিসের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এ কমিটিতে অধ্যাপক আবুল কাশেম, জনাব তোয়াহা, জনাব

নঈমুদ্দীন আহমেদ, জনাব শওকত, জনাব ফরিদ আহমদ এবং সম্ভবত জনাব আখলাকুর রহমান জনাব আব্দুল মতিন খান চৌধুরী ও আজিজ আহমদ ছিলেন। এ ছাড়াও যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাম আজ আর স্মরণ করতে পারছি না। এ কমিটি বাংলা ভাষা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কতকগুলো কর্মসূচী গ্রহণ করে। এ কমিটির প্রচেষ্টায় ১৯৪৮ সালের জানুয়ারীর মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ এবং বিজ্ঞান অনুষদের একটি যুক্ত অধিবেশন হয়। সে অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বাংলাকে এরপর নিম্ন পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হবে এবং মাধ্যম হিসাবে বাংলাকে চালু করা হবে ১৯৫০-৫১ সালের পর থেকেই। প্রস্তাবকে কার্যকরী করার জন্যে একটি পরিভাষা কমিটিও গঠন করা হয়। অবশ্য পরবর্তীকালে এ প্রস্তাব কার্যকরী করা সম্ভবপর হয়নি।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমদিকে মলিমুল্লাহ হলে যে অভিষেক অনুষ্ঠান হয়, সে অভিষেক অনুষ্ঠানে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ডক্টর মাহমুদ হাসান উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে উপাচার্য তাঁর ভাষণের এক অংশে বলেন, দেশের মঙ্গল ও সঠিক উন্নতির জন্য মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করা উচিত। এই সময়েই দেখা যায় যে, বাংলা ভাষা আন্দোলনে উপাচার্য থেকে শুরু করে প্রায় সকল শ্রেণীর শিক্ষক এবং ছাত্রদের বৃহত্তর অংশ সক্রিয় ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে উপাচার্য তাঁর ভাষণের এক অংশে বলেন, দেশের মঙ্গল ও সঠিক উন্নতির জন্য মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করা উচিত। এই সময়েই দেখা যায় যে, বাংলাভাষা আন্দোলনে উপাচার্য থেকে শুরু করে প্রায় সকল শ্রেণীর শিক্ষক এবং ছাত্রদের বৃহত্তর অংশ সক্রিয় ছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে শুধু জনাব শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত ছাত্রলীগ রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাভাষার দাবীকে সমর্থন করেননি। বরং সক্রিয়ভাবে এ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন। পলাশী ব্যারাক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেলে যে গুন্ডা হামলা হয় এর পেছনে সরকারী মহলের এবং মুসলিম লীগ মহলের সমর্থন ছিল। কেননা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেলের এবং পলাশী ব্যারাকে যে বাস এবং ট্রাকগুলোতে চড়ে গুন্ডারা হামলা চালিয়েছিল, সেগুলো সরকারী যানবাহন ছিল। সরকারী যানবাহন ব্যবহার করার জন্যে সরকারের কাছে প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও সরকার এ ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

ঢাকাতে যেমন বাংলা ভাষা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল ঠিক তেমনি দেশের অন্যান্য শহরগুলোতেও এ আন্দোলন ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছিলো। সিলেট, বগুড়া, পাবনা, রংপুর দিনাজপুর, রাজশাহী ইত্যাদি শহরে ভাষা আন্দোলনের তীব্রতা লক্ষ্যণীয়। এই সময়ে কিছু কিছু লোক উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী সম্বলিত 'লিফলেট' প্রচার করে। এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে তৎকালীন 'নওবেলাল' পত্রিকা। মিসেস জোবায়দা সহ বেশ কয়েকজন মহিলা উর্দুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এবং বাংলা ভাষার দাবীকে সমর্থন করে 'নওবেলাল' পত্রিকায় বিবৃতি দেন। রাজশাহীতে গোলাম রহমান, একরামুল হক, আবুল কাশেম চৌধুরী, জনাব মোহাম্মদ সুলতান এবং জনাব গোলম তাওয়াব (প্রাক্তন বিমানবাহিনী প্রধান) প্রমুখের নেতৃত্বে বাংলাভাষার স্বপক্ষে আন্দোলন অব্যাহত থাকে। পাবনাতে প্রসাদ রায়, আমিনুল ইসলাম, আলাউদ্দীন প্রমুখের নেতৃত্বে বাংলা ভাষার আন্দোলন এগিয়ে চলছিল। বগুড়াতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বাংলা বিভাগের অধ্যাপক কবি আতাউর রহমান, শ্যামাপদ সেন, মযহারুল ইসলাম, জালালউদ্দীন আকবর, আব্দুল মতিন প্রমুখের নেতৃত্বে আন্দোলন চলছিলো। বগুড়ায় এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রফেসর আবুল খায়ের, প্রফেসর

গোলাম রসুল, প্রফেসর প্রীতিশ দত্ত। রংপুরে মতিউর রহমান, ইদ্রিস লোহানী, ইউনুস লোহানী, জনাব সোবহান (গাইবান্দা) প্রমুখ এই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। দিনাজপুরে জনাব নুরুল হুদা কাদের বক্স, মুস্তফা নুরুল ইসলাম, এম আর আখতার (মুকুল), দবীরুল ইসলাম এঁরা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। সিলেটে জনাব মাহমুদ আলী বাংলা ভাষা আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী হাজেরা মাহমুদ বাংলা ভাষা আন্দোলনের পক্ষে বলিষ্ঠ ভুমিকা পালন করেন। এ ছাড়া সিলেটে এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন জনাব নূর-উর-রহমান এবং আবদুস সামাদ প্রমুখ। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারীর প্রথম দিকে আর একটি ঘটনা ঘটে, যেটি এ আন্দোলনের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনার নায়ক ছিলেন ফরিদ আহমদ। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বাংলা ভাষার সপক্ষে যে সভা হয়, সে সভায় তিনি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী সম্বলিত প্রস্তাব পাঠ করেন। পরবর্তীকালে যে সব মিছিল বের হয় সে সব মিছিলেরও পুরোভাগে তিনি ছিলেন। এই সময়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ছিলেন এবং একই সঙ্গে ঢাকা কলেজেও শিক্ষকতা করতেন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথমদিকে তাঁকে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারী জনাব আজিজ আহমদ ডেকে পাঠান এবং তিরস্কার করে বলেন যে, সরকারী চাকুরে হিসেবে আন্দোলনে অংশ নেয়া তাঁর পক্ষে একান্ত অনুচিত। জনাব ফরিদ আহমদ এর প্রতিবাদে কলেজের চাকুরী থেকে ইস্তফা দেন। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ফরিদ আহমদের চাকুরী থেকে ইস্তফা দান একটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা ছিল।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে পাকিস্তান গণ-পরিষদের অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে যোগদানের পূর্বে খাজা নাজিমুদ্দিন, হাবিবুল্লাহ বাহার, নূরুল আমিন প্রমুখের সঙ্গে সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন এবং অধিবেশনে বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপিত হলে সে প্রস্তাব সমর্থন করার জন্য মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করেন। এ ছাড়া সংগ্রাম পরিষদ মনিঅর্ডার ফরম ও ডাকটিকেটে উর্দুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা রাখার প্রস্তাব সমর্থন করতে অনুরোধ জানান। গণ-পরিষদের বৈঠক বসে সম্ভবতঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এবং সে বৈঠকে দুটি সংশোধনী প্রস্তাব আনেন গণ-পরিষদের কংগ্রেস দলীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। দুটি সংশোধনীর একটি হলো বছরে অন্ততঃ একবার গণ-পরিষদের বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য হতে হবে, দ্বিতীয় সংশোধনী হলো ইংরেজী এবং উদ্রু সঙ্গে বাংলা ভাষাকেও গণ-পরিষদের ভাষা-হিসাবেও গ্রহণ করতে হবে। এই দুটি প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তৃতা করেন জনাব লিয়াকত আলী খান এবং জনাব গজনফর আলী খান। ফেব্রুয়ারী মাসের ২৫ তারিখের অধিবেশনে তাঁদের বক্তব্যে তারা এই সংশোধনী প্রস্তাব আনার জন্য পরোক্ষভাবে শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং কংগ্রেসদলকে 'পাকিস্তান বিরোধী' বলে আখ্যায়িত করেন। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন কংগ্রেস সদস্য শ্রীরাজকুমার সিংহ। সবচেয়ে অবাক করেছিলেন খাজা নাজিমুদ্দীন। যে নাজিমুদ্দীন বাংলাভাষাকে সমর্থন করবেন বলে পূর্ববঙ্গবাসীকে বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি গণ-পরিষদে বলেন পূর্ব-পাকিস্তানে সমস্ত মুসলমান উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পেতে চায়। প্রথম সংশোধনীটির বিরোধিতা করেন জনাব নজিমুদ্দিন খান। এখানে বলা প্রয়োজন যে, তখন গণ-পারষদে দুই দলীয় সমর্থক সদস্য ছিলেন—মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস। কংগ্রেস দলীয় সদস্যরা সব হিন্দু ছিলেন এবং মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যরা সব মুসলিম ছিলেন। কোন মুসসিল লীগ দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব না করায় এবং পরবর্তীতে খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলা ভাষার বিরোধিতা করায় ও অন্যান্য

মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য নীরব থাকায় জনাব লিয়াকত আলা খান এবং জনাব গজনফর আলী খান একথা বলতে সুবিধে পেয়েছিলেন যে, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীটি শুধুমাত্র পাকিস্তানকে অনৈক্যের দিকে ঠেলে দেয়ার একটি কৌশল। বস্তুতঃ লিয়াকত আলী খান ধীরেন্দ্রনাথ দত্তসহ সমগ্র কংগ্রেস দলীয় সদস্যদের এ প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য দায়ী করেন। গণ-পরিষদে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে সমস্ত প্রতিনিধি ছিলেন বাংলা ভাষার প্রশ্নে তাঁদের নীরবতা এবং জনাব নাজিমুদ্দিন প্রমুখের সক্রিয় বিরোধিতা স্বাভাবিক কারণেই শুধু ঢাকা নয় তদানীন্তন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র-বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং অচিরেই এ বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ১৯৪৮ সালের মার্চের প্রথম সপ্তাহেই সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহ আর বিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। ১৯৪৮ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলনকে বানচাল করার জন্যে তদানীন্তন মুসলিম লীগ দলীয় সরকার এবং জনাব শাহ্ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বাধীন নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের একটি অংশ বিশেষ সক্রিয় ছিল। জনাব আবদুস সামাদের নেতৃত্বে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের মাত্র সিলেট শাখার অংশটি, তমুদ্দুন মজলিস, গণতান্ত্রিক যুবলীগের কর্মীরা এবং নব গঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মীরা সাংগঠনিকভাবে বাংলাভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরাও এ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যঃ এ আন্দোলনে আসেননি। তবে এ আন্দোলনের প্রতি তাদের পুরোপুরি সমর্থন ছিল। বিভিন্ন জায়গাতে তাঁদের যাঁরা কর্মী ছিলেন—তাঁরা এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক দল হিসেবে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ এ দু'টি দলই কাজ করে যাচ্ছিলেন—আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম তখনো হয়নি। কম্যুনিষ্ট পার্টিও প্রকাশ্য এবং সরাসরিভাবে তাঁদের কাজ করতেন না। মুসলিম লীগ দলের একটি অংশ যাঁরা উপদলীয় রাজনীতিতে জনাব সোহরাওয়ার্দীকে সমর্থন করতেন—তাঁরা বাংলা ভাষার আন্দোলনকে সমর্থন করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন জনাব মোহাম্মদ আলী, ডাঃ মালেক, জনাব তফাজ্জল আলী প্রমুখ। এইসব নেতা বিভিন্ন সময়ে ভাষা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে বৈঠক করতেন—আলাপ-আলোচনা চালাতেন, এমনকি তাঁদের নিজেদের বাড়ীতে বসেও বাংলা ভাষা আন্দোলন নিয়ে কথাবার্তা বলতেন। জনাব মোহাম্মদ আলী পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের অভ্যন্তরে বাংলা ভাষার আন্দোলনকে সমর্থন দেন। যার ফলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের জি, ও, সি, মেজর জেনারেল আইয়ুব খান মোহাম্মদ আলীকে পর্যন্ত অপমান করেছিলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে রাষ্ট্রদূতের পদ এবং মন্ত্রীত্ব পেয়ে উক্ত তিনজনই ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন।

এ সময়ে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি নব জাগরণের ঢেউ লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু করে ৬ই মার্চ পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় যুব সম্মেলন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। ইন্দোচীনের জনগণ তখন স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াইয়ে সফলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। ভিয়েতনাম থেকে একটি যুব প্রতিনিধি দল কলকাতার সম্মেলনে অংশ নেন। এছাড়া আরও বহু দেশের প্রতিনিধি এ সম্মেলনে অংশ নেয়। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে দক্ষিণ পূর্ব-এশীয় যুব সম্মেলনে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়। মূলতঃ এই প্রতিনিধি ছিল গণতান্ত্রিক যুবলীগ দ্বারা প্রেরিত প্রতিনিধি দল। এই প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ ছিলেন—জনাব আব্দুর রহমান চৌধুরী (বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি), আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সম্পাদক জনাব শামসুল হক, জনাব শহীদুল্লাহ কায়সার, লিলি খান প্রমুখ। এই দলের নেতৃত্ব দেন জনাব

আব্দুর রহমান চৌধুরী। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় যুব সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে বা প্রতিনিধি পাঠাবার জন্যে জনাব শাহ্ আজিজুর রহমান বিশেষ যত্নবান ছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় যুব সম্মেলনের প্রস্তুতিকমিটি 'নিখিল পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের' অস্তিত্বকে মেনে নেননি। ফলে, শাহ্ আজিজুর রহমানের সে চেষ্টা ফলবতী হয়নি।

এদিকে গণ-পরিষদে জনাব খাজা নাজিমুদ্দিনের বাংলা ভাষার প্রশ্নে ন্যাক্কারজনক ভূমিকার জন্য সারা পূর্ব পাকিস্তানে আগুন জ্বলে ওঠে এবং ২৬শে ফেব্রুয়ারী ঢাকার ছাত্র সম্প্রদায় ধর্মঘট পালন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং অন্যান্য ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস বর্জন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি মিছিল বের হয় এবং এই মিছিলটি রমনা এলাকা প্রদক্ষিণ করে বর্ধমান হাউসে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। খাজা নাজিমুদ্দিন বর্ধমান হাউসেই থাকতেন। অবশ্য ঐ সময়ে তিনি করাচীতে ছিলেন। বিক্ষোভ শেষে এই মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে সমবেত হয় এবং সেখানে 'তমদ্দুন মজলিসের' অধ্যাপক আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য শহরেও অনুরূপ সভা-মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারী কবি আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে বগুড়া কলেজ প্রাঙ্গণে এবং একই তারিখে যশোরে আলমগীর সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভা হয়। গাইবান্ধা এবং রংপুরেও অনুরূপভাবে বিক্ষোভ ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

২রা মার্চ তারিখে ফজফুল হক হল মিলনায়তনে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে যোগ দেন 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ', 'তমদ্দুন মজলিস', 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ', বিভিন্ন হলের ছাত্র নেতৃবৃন্দ এবং প্রগতি লেখক সংঘ ও অন্যান্য যে সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল তাদের প্রতিনিধিগণ। সভায় যাঁরা সেদিন উপস্থিত ছিলেন যতদূর মনে পড়ে তারা হলেন, শামসুল আলম, শওকত ভাই, তোয়াহা সাহেব, তাজউদ্দিন, শহীদুল্লা কায়সার, লিলি খান, কাজী গোলাম মাহবুব, নঈমুদ্দিন আহমদ, সরদার ফজলুল করিম, অজিত গুহ, রণেশ দাস গুপ্ত, কমরুদ্দিন আহমদ, আবুল কাশেম, শামসুল হক, আনোয়ারা খাতুন। ভাষা আন্দোলনকে একটি সার্বিক রূপ দেয়ার জন্যে এবং ধীরে ধীরে এ সংগ্রামকে সারা পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে সভার কর্মীবৃন্দ সবাই এই সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে, যে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম-পরিষদ' রয়েছে তার একটা ব্যাপকতর ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে। এবং এই কমিটিতে বিভিন্ন হল এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি রাখতে হবে। এর ফলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রত্যেক হল, প্রতিষ্ঠান এবং দল থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি নিয়ে একটি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে। প্রস্তাব মোতাবেক 'সংগ্রাম পরিষদকে নতুন রূপ দেয়া হয়। অধ্যাপক নূরুল হক ভুঁইয়া এ সময় ছিলেন না। সুতরাং জনাব শামসুল আলমকে এই সর্বদলীয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম-পরিষদে'র আহবায়ক মনোনীত করা হয়। এই বৈঠকে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং পাকিস্তান গণ-পরিষদের ভাষা থেকে বাংলা ভাষাকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বাদ দেয়ার তীব্র নিন্দা করা হয়। সভায় ১১ই মার্চ '৪৮-এ সমস্ত পূর্ব বাংলায় একটি সাধারণ ধর্মঘটেরও আহ্বান জানানো হয়। এই আহ্বান জানানোর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় 'রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম-পরিষদ' গড়ে উঠে। এবং এই সংগ্রামকে অব্যাহত রাখার জন্য সাংগঠনিক তৎপরতা চলতে থাকে।

বগুড়াতে কবি আতাউর রহমানকে আহবায়ক করে একটি 'বাংলা ভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়। বগুড়ার কমিটিতে অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রী প্রতিনিধি ছিলেন। বগুড়ায় যে দু'জন ছাত্রী

এই কমিটিতে ছিলেন, তারা হলেন রহিমা খাতুন এবং সালেহা খাতুন। (পরবর্তীকালে সালেহা চক্রবর্তী)। পাকিস্তানের জন্মের অব্যবহিত পর মুসলিম পরিবার থেকে এ দু'জন ছাত্রীর দুঃসাহসিক কর্মতৎপরতা সেদিন বগুড়াবাসীকে বিস্মিত না করে পারেনি। রহিমা খাতুন সম্পর্কে একটি কথা না বলে পারছি না। তিনি যখন আমাদের এ কমিটির বৈঠকে উপস্থিত হলেন তখন তার সম্পর্কে সংশয়হীন হওয়ার জন্য আমরা তার অভিভাবক ডাক্তার মুজাফফর রহমানের সংগে সাক্ষাৎ করি। মোজাফফর সাহেব আমাদের কথা শুনে বললেন, "বাংলা ভাষা আন্দোলনের জন্য আমার বোন সংগ্রাম কমিটির সদস্যা হয়েছে এতে আমি গর্ববোধ করছি।" জনাব মুজাফফর আহমদ মুসলিম লীগের সদস্য ছিলেন, কিন্তু বাংলা ভাষা আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় সমর্থন ছিল। বগুড়া জেলা মুসলিম লীগের একটি বড় অংশ বাংলা ভাষা আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। তবে মুসলিম লীগ দলের অপর অংশও আন্দোলনে বাধাদানের জন্য সর্বদা সক্রিয় ছিল। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। যশোহরে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম আহবায়িকা হামিদা সেলিম-এর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলে অন্যায় করা হবে। যশোহরের '৪৮-এর ভাষা আন্দোলনে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিলো। অনুরূপভাবে যেসব মহিলা '৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা হলেন, মিসেস জোবেদা, সৈয়দা লুৎফুন্নেসা, সৈয়দা নাজিবুন্নেসা এবং রাবেয়া খাতুন।

সিলেট শহরে মার্চের প্রথম দিকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে যে সভা হয়েছিল তাতে সভাপতিত্ব করেন জনাব মাহমুদ আলী। এ সভায় উর্দু ভাষার সমর্থকরা আক্রমণ চালায় এবং কিছু ছাত্রকে তারা প্রহার করে।

এরপর সিলেটে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলনে এ সময় নেতৃত্ব দেন জনাব একরামুল হক, গোলাম রহমান, আবুল কাশেম চৌধুরী, জনাব গোলাম তাওয়াব (প্রাক্তন বিমান বাহিনী প্রধান) প্রমুখ। রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলনের মিছিলের ওপর হামলাকে কেন্দ্র করে একটি উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। কারণ ভাষার দাবীতে যে মিছিল বের হয় তার ওপর গুণ্ডারা হামলা চালালে জনাব তাওয়াব গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং এক পর্যায়ে মূল মিছিল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তিনি গুণ্ডাদের দ্বারা ভীষণভাবে প্রহৃত হয়। সুতরাং ভাষা আন্দোলনকে বানচাল করার জন্যেও সংঘবদ্ধভাবে উর্দু সমর্থকরা সরকারী সমর্থনে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল। এমনি অবস্থায় ১১ই মার্চে ঢাকাতে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। এই দিবসে ঢাকায় সাধারণ ধর্মঘট পূর্ণ সাফল্য লাভ করে।নেতৃস্থানীয় কর্মীরা প্রত্যেক পিকেটিং এ অংশ নেন এবং রেলওয়ে ওয়ার্কশপ ও সেক্রেটারিয়েট অর্থাৎ ইডেন বিল্ডিং এর গেটে পিকেটিং করেন। সেদিন যারা পিকেটিং-এ অংশ নেন এবং নেতৃত্ব দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন জনাব শওকত আলী, শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, তোয়াহা, অলি আহাদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, শামসুল আলম, কাজী গোলাম মাহবুব, আবদুল মোমেন, আবদুল মতিন, আবদুল মালেক উকিল, জনাব গোলাম আযম এবং আরো অনেকে। পিকেটিং করার জন্য শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব, রণেশ দাসগুপ্ত সহ আরও অনেককে ঐদিন গ্রেফতার করা হয়। মোহাম্মদ তোয়াহাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়। সেদিন ছাত্র সমাবেশে ছাত্রদের ওপর পুলিশী হামলায় ১৪ ব্যক্তি আহত এবং ৬০ জনেরও অধিক গ্রেফতার হন।

১১ই মার্চের ধর্মঘট শুধু ঢাকাতে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই ধর্মঘট পূর্ববাংলার সবকটি জেলার সবকটি শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এ সম্পর্কের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। ঘটনাটি ঘটেছিল

বগুড়াতে। বগুড়াতে ১১ই মার্চের যে মিছিল হয় সে মিছিলে নেতৃত্ব দেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ডঃ শহীদুল্লাহ ছিলেন তখন বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষ। আমরা যখন বগুড়া কলেজ থেকে মিছিল করে বগুড়া শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন ডঃ শহীদুল্লাহ রিক্সা করে কলেজের দিকে যাচ্ছিলেন। আমরা তাঁর রিকসা থামিয়ে তাঁকে অনুরোধ করলাম তিনি যেন আমাদের মিছিলের নেতৃত্ব দেন। ডঃ শহীদুল্লাহ রিক্সা থেকে নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে মিছিলে অংশ গ্রহণকারী কর্মীরা তুমুল করতালির মধ্য দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। তিনি তখন আমার দিকে তাকিয়ে তাঁর স্বভাবসুলভ ষ্টাইলে বললেন, মানে কি যে আঁ আমাকে কি করতে হবে ? আমি বললাম স্যার, আপনাকে মিছিলের নেতৃত্ব দিতে হবে এটা আমাদের দাবী। তিনি কিছুক্ষণ ভাবলেন তারপর একটু হেসে তাঁর চিরপরিচিত সেই ব্যাগটি আমার হাত দিয়ে সমানে কি যে আঁপীর সাহেব, তাহলে তুমি আমার বোঝাটা নাও আর আমি তোমার বোঝাটা নিয়ে নিলুম'। এখানে বলা প্রয়োজন যেহেতু আমার বাবা পীর সাহেব ছিলেন সেহেতু ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মাঝে মাঝে আমাকে ঠাট্টা করে পীর সাহেব বলে ডাকতেন। সেদিন বগুড়া জেলা স্কুল ময়দানে সেদিনের সভার সভাপতি ছিলেন তিনি। সভাপতি হিসেবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর স্বপক্ষে দীর্ঘ সময়ব্যাপী যে যুক্তি ও তথ্য নির্ভর ভাষণ তিনি রেখেছিলেন তা সেদিনের জনসমাবেশকে বিমোহিত করেছিলো। বগুড়াতে ১১ই মার্চ-এ বাংলা ভাষা আন্দোলনে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন শাসকচক্র তাদের বিরুদ্ধে কোনও হামলা করার সাহস পায়নি। কিন্তু অন্যান্য জায়গায় যেমন যশোহরে, চট্টগ্রামে, রংপুরে, রাজশাহীতে 'নিখিল পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' এবং মুসলিম লীগের ভাড়াটিয়া গুন্ডারা মিছিলের ওপর হামলা চালায়।

১১ই মার্চের পুলিশী হামলার বিরুদ্ধে ১৪ই মার্চ পূর্ব-বাংলার সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হয়। এবং এই ধর্মঘটে প্রতিটি জেলার ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে। সেদিন (১৪ মার্চ) ঢাকাতে ফজলুল হক হলে সংগ্রাম কমিটির একটি বৈঠক হয়। বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় সন্ধ্যাবেলা। এই বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আনোয়ারা খাতুন। তিনি তখন এম এল এ। যেহেতু তিনি তফাজ্জল আলী প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন এবং যেহেতু জনাব তফাজ্জল আলীদের গ্রুপ ভাষা আন্দোলনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন, সেহেতু ফজলুল হক হলের ঐ সভায় আনোয়ারা খাতুনকে অংশ গ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। ১৪ই মার্চের সংগ্রাম কমিটির সভায় জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ১৫ই মার্চ সাধারণ ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব রাখেন। বক্তব্যের পিছনে যুক্তি ছিল যে, যেহেতু ১৫ই মার্চ পূর্ব-পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন বসবে সেহেতু ঐ দিনই ধর্মঘটের উপযুক্ত দিন। এই প্রস্তাব সমর্থন করেন জনাব তোয়াহা। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ১৪ই মার্চ রাতে জনাব আবদুল মতিন, জনাব আবদুল মোমেন (প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী) এবং জনাব গোলাম আযম গ্রেফতার হন। রাতেই তাঁদের গ্রেফতারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে।

১৫ই মার্চ বৃষ্টি হচ্ছিলো। ছাত্ররা বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে পিকেটিং শুরু করে। ১৫ তারিখের ধর্মঘটে সেক্রেটারিয়েটের বাঙ্গালী কর্মচারীরা যোগদান করেন। এবং ঐদিন দুপুরের দিকে রেল কর্মচারীরাও ধর্মঘটে অংশ নেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে ডাঃ করিম (পরবর্তীতে মওলানা ভাসানীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন) তাঁর এ্যাম্বুলেন্স গাড়ী নিয়ে এ সময় ভাষা আন্দোলনের কর্মীদের একস্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ১৫ই মার্চ পিকেটিংএ যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁদেরকে বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের গেটের সামনে পুলিশ একবার কাঁদানে গ্যাসও নিক্ষেপ করে।

কিন্তু সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে ছাত্র জনতা পরিষদ ভবন সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। ঐ দিন বেলা ১১-৩০ টার দিকে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম-পরিষদ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। এবং ঐদিনই দুপুরে গভর্ণর হাউসে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সংগ্রাম পরিষদের কর্মীবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন। সংগ্রাম-পরিষদের পক্ষ থেকে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা হলেন জনাব তোয়াহা, জনাব আবদুর রহমান চৌধুরী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব নঈমুদ্দিন আহমদ, আজিজ আহমদ, অধ্যাপক আবুল কাশেম, জনাব কমরুদ্দিন আহমদ প্রমুখ। এ বৈঠক চলাকালে খাজা নাজিমুদ্দিন এবং সংগ্রাম- পরিষদের কর্মীবৃন্দের মাঝে বচসা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দের অনমনীয় মনোভাবের জন্যে জনাব নাজিমুদ্দিন সংগ্রাম পরিষদের আট দফা দাবী মেনে নিয়ে একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির ফলে ভাষা আন্দোলনে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের ১৫ তারিখের সন্ধ্যায় মুক্তি দেয়া হয়। ১৫ই মার্চে পরিষদের অভ্যন্তরে বগুড়ার জনাব মোহাম্মদ আলী, শেরে বাংলা এ কে এম ফজলুল হক, আনোয়ারা খাতুন প্রমুখ ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে তাঁদের বক্তব্য রাখেন।

১৫ই মার্চ সন্ধ্যায় বন্দীদের মুক্তির পর স্বভাবতঃ সরকার মনে করেছিল যে বাংলা ভাষা প্রশ্নে ছাত্ররা হয়তো আর কোনও আন্দোলনে যাবে না। কিন্তু দেখা গেল ১৬ই মার্চ পুনরায় আন্দোলন-বিক্ষোভ শুরু হলো। এ বিক্ষোভ ১৭ তারিখেও অব্যাহত থাকে। ধর্মঘট-বন্ধ পালিত হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নঈমুদ্দিনের সভাপতিত্বে সভা হলো। সংগ্রাম-পরিষদের কর্মীরা পরিষ্কার জানতো যে কিছুদিন পর কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা আসছেন এবং তিনি বাংলা ভাষার ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন। এ জন্যেই সংগ্রাম-পরিষদ তাঁদের চাপ অব্যাহত রেখেছিলেন। ১৭ই মার্চ সন্ধ্যায় ফজলুল হক হলের হাউস টিউটার ডঃ মযহারুল হকের কামরায় বসে ভাষা আন্দোলনের সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ডঃ মযহারুল হকের এই কামরাটি সংগ্রাম-পরিষদের কর্মীদের বৈঠকের জন্য মাঝে মাঝেই ব্যবহৃত হতো। এ থেকেও এটি প্রমাণিত হয় যে,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মহল বাংলা ভাষা প্রশ্নে সব সময়ে অত্যন্ত সহায়ক শক্তিরূপে কাজ করেছিলেন। ১৮ই মার্চেও সংগ্রাম কমিটির একটি সভা হয়। সে সভায় স্থির হয় যে, কায়েদে আজম ঢাকা এলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে এবং বাংলা ভাষার দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি তাঁকে দিতে হবে।

১৯ মার্চ জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা বিমানবন্দরে পৌছান। ২১শে মার্চ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে কায়েদে আজম জিন্নাহকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এ সভায় মিঃ জিন্নাহ যখন বলেন 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' তখন বাংলা ভাষার সমর্থকরা 'না' 'না' বলে মিঃ জিন্নাহর কথার প্রতিবাদ করেন। অবশ্য সে বিশাল জনসমুদ্রে সেদিন এ প্রতিবাদের স্বর বিশেষ জোরালো ছিল না। ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সে অনুষ্ঠানে মিঃ জিন্নাহ ভাষা সমস্যা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বললেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা—অন্য কোনও ভাষা নয়'। সঙ্গে সঙ্গে জনাব মতিন এবং জনাব আহসান উঠে দাঁড়িয়ে 'না' 'না' বলে চিৎকার করে ওঠেন এবং এর পরপরই সমগ্র হল 'না' 'না' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠে। কায়েদে আজম কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন এবং তাঁর বক্তব্য তাড়াতাড়ি শেষ করে কার্জন হল ছেড়ে চলে যান। ২৪শে মার্চ সন্ধ্যায় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদ নেতৃবৃন্দ জনাব জিন্নাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন জনাব শামসুল হক, অধ্যাপক আবুল কাশেম, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, নঈমুদ্দিন আহমদ, জনাব তোয়াহা, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, জনাব অলি আহাদ এবং আরও কয়েকজন। আলোচনায় সংগ্রাম-পরিষদের সঙ্গে এক পর্যায়ে

জনাব জিন্নাহর কথা কাটাকাটি হয়। ফলে, কোনও সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি। ইতিপূর্বে ছাত্রদের পক্ষ থেকে জনাব তোয়াহা রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে একটি স্মারকলিপি মিঃ জিন্নাহর কাছে পেশ করেছিলেন। ২৪শে মার্চের পরও জনাব জিন্নাহ ভিন্ন ভিন্নভাবে বিভিন্ন ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ দেন। তখন জনাব শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বাধীন নিখিল পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিনিধিরা কায়েদে আজমকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে ভাষা আন্দোলন যাঁরা করছেন তাঁরা রাষ্ট্রের শত্রু এবং এ সমস্ত ব্যক্তিরা কিছুদিন আগে কোলকাতায় এশীয় যুব সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেছে এবং তাদের ছবি ভারতের 'স্বাধীনতা', 'আনন্দবাজার' ইত্যাদি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। ফলে জনাব জিন্নাহ বাংলা ভাষা আন্দোলন এবং ভাষা আন্দোলনকারীদের সম্পর্কে একটি বিরূপ মনোভাব নিয়েই ঢাকা ত্যাগ করেন।

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে ঢাকার সাধারণ মানুষ পূর্ণ সমর্থনে এগিয়ে না আসার জন্য এ আন্দোলন ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে পড়ে। কারণ হিসাবে আরং বলা যায় যে, ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের ব্যবস্থাপক সভার মুসলিম লীগ দলীয় যে সব সদস্য জড়িত ছিলেন এবং যাঁরা এ আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছিলেন পরিষদের অভ্যন্তরে তাঁরা পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঢাকা আসার পরই এ আন্দোলনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে দূরে সরে দাঁড়ান। এখানে বলা প্রয়োজন যে, সে সময় যাঁরা মুসলিম লীগ করতেন তাঁদের মধ্যে মরহুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীও ছিলেন। কিন্তু তিনি মাত্র কিছুদিন আগে আসাম থেকে পূর্ববঙ্গে আসেন এবং টাঙ্গাইল কেন্দ্র থেকে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছিলেন পুরোপুরি, কিন্তু যেহেতু তখনও পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের রাজনীতিতে বা মানুষের কাছে তিনি তেমন কোনও স্থান করে নিতে পারেননি, সেহেতু তাঁর সমর্থনও সে সময় কার্যকরী হয়নি।

সম্ভবতঃ ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগে পূর্ব-বাংলার আইন পরিষদে বাংলা ভাষাকে ইংরেজীর জায়গায় সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয়। এবং বাংলা ভাষা পূর্ব-বাংলায় যথাসম্ভব শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা যায় কি না তার জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসের সেই অধিবেশনেই বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করে বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে সংশোধনী প্রস্তাবটি আনেন তার তীব্র বিরোধিতা করেন জনাব খাজা নাজিমুদ্দিন। এবং তাঁকে সমর্থন করে এবং শ্রীদত্তের সংশোধনী প্রস্তাবের সমালোচনা করে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন জনাব সবুর খান। এই অধিবেশনে আরও একটি বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছিল। তা হলো অনাহূতভাবে এবং অযাচিতভাবে ভাষার ওপর বক্তৃতা দিতে গিয়ে তৎকালীন মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার আরবী হরফ অন্যথায় রোমান হরফে বাংলা লেখার পক্ষে ওকালতি করেন।

খাজা নাজিমুদ্দান ১৫হ মাচ রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলেন সে চুক্তিতে একটি শর্ত ছিল যে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা এবং তার জন্য সুপারিশ করা হবে। এখানে একথা বলার প্রয়োজন মনে করছি এই জন্য যে, সেই চুক্তিতে যে এত শীঘ্র খাজা নাজিমুদ্দীন ভঙ্গ করবেন এবং সমগ্র জাতির কাছে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করবেন, অন্ততঃ সুধী সমাজের কেউ তা বিশ্বাস করতে পারেননি। সুধী সমাজ খাজা নাজিমুদ্দীনের সেদিনের বক্তৃতা শুনে বিস্মিত হতবাক হয়েছিলেন; বিস্মিত হয়েছিলেন আরো এ জন্যে যে, পূর্বে পরিষদের অভ্যন্তরে যাঁরা বাংলা ভাষার পক্ষে কথা বলেছিলেন, বাংলা ভাষার

আন্দোলনকারীদের স্বপক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন সেই জনাব মোহাম্মদ আলী, জনাব তফাজ্জল আলী এবং ডাঃ মালেক, খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের এই বাংলাভাষা বিরোধী বক্তৃতারতো কোনও প্রতিবাদ করেনইনি, এমন কি বাংলাভাষার স্বপক্ষে একবার মুখও খোলেন নি। অথচ ১৫ই মার্চ তারিখে খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের যে বৈঠক হয়, এবং যে বৈঠকে জনাব খাজা নাজিমুদ্দীন কর্ম-পরিষদের দাবী আট-দফা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন তার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এই মোহাম্মদ আলী প্রমুখরা। অবশ্য পরে জানা গেছে তাঁদের এই নীরবতার কারণ মন্ত্রীত্ব এবং রাষ্ট্রদূতের পদ লাভ।

১৯৪৮-র নভেম্বরের শেষ ভাগে জনাব লিয়াকত আলী খান ঢাকায় আসেন। তিনি তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর পূর্ববঙ্গে আগমন উপলক্ষে রাজশাহীতে ছাত্র বিক্ষোভ হয়। এ ছাত্র বিক্ষোভের জন্য সেখানে ছাত্রদের উপর পুলিশী নির্যাতন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আবুল কাশেম চৌধুরীসহ কয়েকজন ছাত্রকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। ঢাকায় ২৭শে নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমন্যাসিয়াম গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বক্তৃতা করেন। তাঁর আগমন উপলক্ষে ঢাকার ছাত্র সমাজেও বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ছাত্ররা কালো পতাকা দেখাবার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ডঃ মাহমুদ হোসেনের মধ্যস্থতায় বিষয়টির মীমাংসা হয় এভাবে যে ছাত্রদের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদের সাধারণ সম্পাদক জনাব গোলাম আযম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে একটি মানপত্র দেবেন এবং সে মানপত্রে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। ২৭ নভেম্বরের এই সভায় লিয়াকত আলী খানকে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জনাব গোলাম আযম যে মানপত্র দেন তাতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে, গণ-পরিষদে অন্যতম ভাষা চালু করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় বাংলাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। জনাব গোলাম আযম যখন তাঁর দাবীগুলি উত্থাপন করেন তখন ছাত্র জনতা হাততালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। জনাব লিয়াকত আলী খান এতে স্বাভাবিকভাবেই একটু রুষ্ট হন। তিনি যখন তার বক্তৃতায় কৌশলে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা বললেন তখন ছাত্রদের মধ্য থেকে না না ধ্বনিটি বারবার উচ্চারিত হয়।

সম্ভবতঃ ১৯৪৮-এর ডিসেম্বরের শেষে পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন প্রাদেশিক মন্ত্রী জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার। এ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় কার্জন হলে। এই সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের একটি বিশেষ দিক হলো এই যে, সম্মেলনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়া। সভাপতির ভাষণে ডঃ শহীদুল্লাহ আরবী হরফে অথবা রোমান হরফে বাংলা লেখার ঘৃন্য ষড়যন্ত্রের তীব্র বিরোধিতা করে জোরালো বক্তৃতা করেন। শুধু তাই নয় সভাপতির ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি বলেন আমরা হিন্দু বা মুসলমান তা যেমন সত্য, তার চেয়েও বেশী সত্য আমরা বাঙ্গালী। এটি কোনও আদর্শের কথা নয় এটি একটি বাস্তব সত্য। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এই ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের পক্ষে এদেশের মাটিতে প্রথম বক্তব্য বলা যেতে পারে। পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের অন্যান্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ আলী আশরাফ, সৈয়দ আলী আহসান, অজিত কুমার গুহ, কবি জসীমউদ্দীন, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ প্রমুখ।

১৯৪৯ সালের ৮ই জানুয়ারী সমগ্র পূর্ববঙ্গে জুলুম প্রাতরোধ দিবস পালন করা হয়। কারণ এ সময় ভাষা আন্দোলন এবং বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনের জন্য ছাত্রদের ওপর নানা রকম শাস্তিমূলক আদেশ দেয়া হয়েছিল বিশেষ করে রাজশাহীতে আবুল কাশেম চৌধুরীসহ তিনজন ছাত্রকে বহিষ্কার করার ঘটনাটি তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। এ সবের বিরুদ্ধে ৮ই জানুয়ারী সারা পূর্ববঙ্গে ধর্মঘট পালিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানে সভা হয়। এ সভায় সভাপতি করেন জনাব নঈমুদ্দীন আহমদ এবং বক্তব্য রাখেন জনাব আব্দুর রহমান চৌধুরী, শেখ মুজিবুর রহমান, দবিরুল ইসলাম প্রমুখ।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে আর একটি ঘটনা ঘটে। ১৯৪৮ সনে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন ঢাকা আসেন তখন 'নিখিল পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে'র সাধারণ সম্পাদক জনাব শাহ আজিজুর রহমান এবং সভাপতি জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী মিঃ জিন্নাহকে এবং পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে বুঝিয়েছিলেন যে তাঁরা এবং তাঁদের সংগঠনই পূর্ব-পাকিস্তানে ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব করেন। সুতরাং এর জবাব দেবার জন্য 'পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে'র পক্ষ থেকে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল এবং ফজলুল হক হলের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকেই জনাব নঈমুদ্দীন আহমদকে আহ্বায়ক করে পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ কমিটি গঠিত হয়েছিল। ১৯৪৯ সালে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের মনোনীত এবং গণতান্ত্রিক যুব লীগ কর্তৃক সমর্থিত প্রার্থী ছিলেন জনাব আব্দুর রহমান চৌধুরী। তিনি এবং তাঁর দলের প্রত্যেকটি প্রার্থী বিপুল ভোটে নিখিল 'পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীদের পরাজিত করেন। এ দুটি নির্বাচনে এটি প্রমাণ হয়ে যায় যে, 'নিখিল পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে'র সমর্থক ছাত্রদের সংখ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ে নগণ্য।

১৯৪৯ সালে আর একটি ঘটনা ঘটে—এ প্রসঙ্গে সে ঘটনার উল্লেখও প্রয়োজন বলে মনে করি। সেটি হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিম্ন কর্মচারীদের ধর্মঘট। কর্মচারীরা বিভিন্ন দাবী দাওয়ার প্রেক্ষিতে ধর্মঘট পালন করে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমাজ কর্মচারীদের এ ধর্মঘট পালন করে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমাজ কর্মচারীদের এ ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন দেন। এবং তাদের সমর্থনে ধর্মঘট পালন করে। '৪৯ সালের মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম ভাগে জনাব আব্দুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি সভা হয়। সে সভায় বিশ্ববিদ্যালয় নিম্ন কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া পূরণ না হওয়া পর্যন্ত উপাচার্যের বাসভবনে অবস্থান ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সে সিদ্ধান্ত অনুসারে অবস্থান ধর্মঘট চলতে থাকে। ১০ই মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১১ই মার্চ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ এবং সঙ্গে সঙ্গে হলগুলিও বন্ধ করে দেবার কথা ঘোষণা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ হঠকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১২তারিখে মিছিল হলো। এ মিছিলের একটি অংশ পরিষদ ভবনের সামনে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এই দাবীতে বিক্ষোভ করতে থাকে। এই বিক্ষোভ করাকালে যশোহর থেকে আগত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সৈয়দ আফজল হোসেন, বাহাউদ্দীন চৌধুরী প্রমুখ গ্রেফতার হন। সন্ধ্যার দিকে বিভিন্ন হলে ছাত্র কর্মকর্তাগণ পুনর্বার বৈঠকে বসেন এবং সিদ্ধান্ত নেন যদিও বিশ্ববিদ্যালয় এবং হলগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে তবুও ছাত্ররা নিজেদের উদ্যোগেই ডাইনিং হল চালু রাখবেন এবং হল কোনও অবস্থাতেই ত্যাগ করবেন না। কিন্তু দেখা গেল সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই হল ছেড়ে চলে যান।

এ সময়ের একটি ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ছে। আমি তখন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের দোতলায় ১৬নং কক্ষে থাকি। এ কক্ষে দুটি সিট ছিল একটি আমার, অপরটি বরিশালের ছাত্র আমার বন্ধু আলী আশরাফের। আশরাফ হল ছেড়ে চলে গেলেন। আশরাফের সেই বিছানা সাময়িকভাবে দখল করলেন জনাব শেখ মুজিবুর রহমান। আমরা দু'জন ১৬নং রুমে থেকে যাই। জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের শরীরে তখন ব্যাপক চুলকানি পাঁচড়া জাতীয় চর্মরোগ দেখা দিয়েছে। চর্মরোগের যে ঔষধ তিনি এনেছিলেন তা শরীরে লাগালে তার গন্ধে যোল নম্বর কক্ষে থাকা অত্যন্ত দায় হয়ে পড়তো। কিন্তু নির্বিবাদে শেখ মুজিব ঔষধ লাগিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকতেন। একদিন সন্ধ্যার পর সারাদিনের মিছিল শেষে ক্লান্ত হয়ে দুজনে শুয়ে আছি হঠাৎ শেখ মুজিব পাশ ফিরে বললেন, "গাজী কি করছিস" ? আমি বললাম 'চুপচাপ ভাবছি', তিনি বললেন, 'দেয়ালের দিকে তাকিয়ে তো কোনও ভাবার মানে হয় না, জানালার দিকে তাকিয়ে দেখ'। পাশ ফিরে জানালার দিকে তাকিয়ে দেখি পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, চাঁদের সেই আলোর কিছু অংশ আমাদের যোল নম্বর ঘরের জানালা ডিঙ্গিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে। 'কি দেখছিস' ? বললেন শেখ মুজিবুর রহমান। আমি বললাম, 'পূর্ণিমার চাঁদ'। হেসে বললাম আবার, "চুলকানি আর পূর্ণিমার চাঁদ এ দুটোরই একত্রে অবস্থান হবে ?" উত্তরে শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, "যে দ্যাশে জন্মেছিরে আর যে ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি তাতে চুলকানিও সহ্য করতে হবে আর পূর্ণিমার চাঁদও দেখতে হবে, বুঝলি" ? আমি হো হো করে হেসে উঠলাম, "আরে মুজিব ভাই কবিত্ব করো না—ওটা তোমায় মানায় না।" উত্তরে ধমক দিয়ে বললেন, 'ওটা কি তোদের একচেটিয়া নাকি ?' সেদিনের সে স্মৃতি আজ আবার নতুন করে মনে পড়ছে। চাঁদ আজও ওঠে আর রোগ যেটুকু তাও রয়ে গেছে। জানিনা কবে সে রোগের উপশম হবে।

যাক ফিরে যাই আবার অতীতের স্মৃতি রোমন্থনে। বিশ্ববিদ্যালয় নিম্ন-কর্মচারী ধর্মঘটকে উপলক্ষ করে বা একে কেন্দ্র করে ১৯৪৯ সালের মার্চের শেষ সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২৭জন ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ছয়জনকে চার বছরের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন দবিরুল ইসলাম, অলি আহাদ, সমীর বোস, আব্দুল মান্নান এরা। এ ছাড়া ১৫জন ছাত্রকে বিভিন্ন হল থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হয়। তার মধ্যে ছিলেন জনাব আব্দুর রহমান চৌধুরী, (বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি) জনাব মোল্লা জালালউদ্দীন আহমদ, জনাব দেওয়ান মাহবুব আলী, জনাব আব্দুল মতিন খান চৌধুরী (বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি), আব্দুর রশীদ ভুঁইয়া, অরবিন্দ বোস, আব্দুল মতিন, সৈয়দ জামাল কাদেরী এবং আরো সাতজন। এছাড়া পনেরো টাকা করে জরিমানা করা হয়, জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, কল্যাণ দাসগুপ্ত, নঈমুদ্দীন আহমদ, নাদিরা বেগম, এমনি ছয়জন ছাত্র-ছাত্রীকে। এখানে বলা প্রয়োজন, হল থেকে বহিষ্কার করার অর্থ হলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা।

১৯৪৯ সালে নিম্ন কর্মচারী ধর্মঘটে নাদিরা বেগম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। এর কিছুদিন পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। জেলখানায় অনশন করার জন্যে নাদিরা বেগমকে বিচারের জন্যে ঢাকা জেলগেটে নিয়ে গেলে তিনি এই ক্যামেরা ট্রায়ালের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ চিৎকার করতে থাকেন। এসময়ে ম্যাজিস্ট্রেট নাদিরা বেগমের প্রতি দুর্ব্যবহার করলে নাদিরা বেগম তাকে লক্ষ্য করে জুতা ছুঁড়ে মারেন। এর পরে নাদিরা বেগমকে জেল পুলিশ জোর করে ভেতরে নিয়ে যায় এবং তাঁকে নির্দয়ভাবে প্রহার করে। নাদিরা বেগম ছিলেন তখন বামপন্থী আন্দোলনে রূপকথার নায়িকার মতো।

নিম্নকর্মচারী ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের এ বহিষ্কার, কিংবা যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয় তার বিরুদ্ধে ১৭ই এপ্রিল সারা পূর্ববঙ্গে ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ১৭ই এপ্রিল সমগ্র পূর্ববঙ্গেই ধর্মঘট পালিত হয়েছিলো। তবে সরকারী পক্ষ থেকে এবং সরকার দলীয় মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে বিশেষ করে নিখিল 'পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগে'র পক্ষ থেকে কোথাও গুন্ডা লেলিয়ে দেয়া হয়। মিছিলের ওপর হামলা চালানো হয়। বগুড়ায় ১৭ই এপ্রিলের মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জনাব এহসানুল কবীর (বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব)। সেই মিছিলের ওপর গুন্ডার হামলা হয় অতর্কিতে এবং ছাত্রনেতা আব্দুস শহীদ গুরুতরভাবে আহত হন। পিকেটিং-রতা ছাত্রী সালেহা খাতুন হন লাঞ্ছিতা। রাজশাহীতে জনাব গোলাম রহমান গুন্ডা হামলার শিকার হন। বরিশালে জনাব শামসুল হক চৌধুরীকে ২০শে এপ্রিল গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ১৭ই এপ্রিল প্রদেশব্যাপী হরতাল সম্পূর্ণরূপে সফল হয়।

নিম্নকর্মচারী ধর্মঘট আন্দোলনে জনাব নঈমুদ্দীন আহমদ এবং 'পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র লীগের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন কর্মী কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করা সত্ত্বেও ছাত্ররা এগিয়ে যায়। ১৮ই এপ্রিল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট করতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০শে এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ঢাকা কলেজ, ইডেন কলেজ, এবং প্রতি স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়। ধর্মঘটি ছাত্ররা মিছিল করে যখন ঢাকা হলের সম্মুখ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন তাদের ওপর পুলিশ লাঠি চার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এর ফলে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র আহত হয় এবং তাদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ২০শে এপ্রিল জনাব অলি আহাদ, জনাব আব্দুল মতিন, জনাব খালেক নওয়াজ খান, বাহাউদ্দীন আহমদ, নিতাই গাঙ্গুলীসহ বহু ছাত্র গ্রেফতার হন। এদের অনেককে জেলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অনেককে অনেক দূরে নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। একটি ট্রাকে করে আজকাল যেমন উত্তরবঙ্গ থেকে গরু নিয়ে আসা হয় ঠিক তেমনি বোঝাই করে টঙ্গী থেকেও কয়েক মাইল দূরে নিয়ে ছেড়ে দেয়। এবং সবচেয়ে মজার কথা হলো, আমাদের ছেড়ে দেয়ার সময় আমাদের পকেটের পয়সাগুলো দয়া করে পুলিশ কনষ্টেবলরা পকেট হাতড়ে বের করে নেয়। ফলে সারা রাত হেঁটে পরদিন ভোরবেলা ঢাকা এসে পৌছাই। এর পর আবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ২৫শে এপ্রিল সাধারণ ধর্মঘট করা হবে। এ ধর্মঘটকে মোকাবেলা করার জন্যে পূর্ববঙ্গ সরকার ঢাকাতে ১৪৪ ধারাও জারি করেছিলেন।

পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৪৯ সালের ২৫শে এপ্রিল একটি যুগান্তকারী দিন। এই দিন ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সর্বপ্রথম যোগ দিয়েছিলেন সরকারী কর্মচারীরা, রিক্সাওয়ালারা। ছোট ছোট দোকানদারেরা দোকান-পাট বন্ধ করে যোগ দিয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কিংবা কলেজের ছাত্রদের সেদিন পিকেটিং করতে হয়নি। সেদিন পিকেটিং করেছিলেন দোকানদারেরা এবং সরকারী কর্মচারীরা নিজেরাই। ১২টার দিকে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দলে দলে ছাত্র এবং ঢাকার জনসাধারণ মিছিল করে ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে এসে জমায়েত হয়। জনাব তাজউদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে এক ছাত্র জনসভা অনুষ্ঠিত হলো। সভাশেষে ছাত্র এবং জনসাধারণ মিছিল করে সেক্রেটারিয়েটের দিকে এগিয়ে যান। সেদিন যখন এ মিছিল এগিয়ে যাচ্ছিল তখন নাজিরাবাজার রেলক্রসিং-এর সম্মুখে পুলিশ তাদের গতিরোধ করে এবং সেখানে লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এর পরে ছত্রভঙ্গ মিছিল আবার একত্রিত হয়ে ফুলবাড়িয়া ষ্টেশনের

পর নবাবপুর রেলক্রসিং-এর দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে। সেখানেও ছাত্রদের ওপর লাঠিচার্জ করা হয় ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়। পুলিশ হোটেল রেষ্টুরেন্ট থেকে লোকদের ধরে নিয়ে বেদম প্রহার করে। বহু সংখ্যক ছাত্র সেখানে গ্রেফতার হয়। ১৯৪৯ সালের নিম্নকর্মচারী ধর্মঘটে এত অত্যাচার এত জুলুম সহ্য করে ছাত্র সমাজ এগিয়ে যাবার পরেও এবং এই ধর্মঘটে এই আন্দোলনে ঢাকার জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন লাভ করা সত্ত্বেও আন্দোলন সফল হতে পারেনি। কারণ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দই আন্দোলন সম্পর্কে একমত ছিলেন না। বিশেষ করে নঈমুদ্দীন আহমদ এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মীর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণের ফলে ১৯৪৯ সালের নিম্নকর্মচারী ধর্মঘটের শোচনীয় অবসান ঘটে।

১৯৪৯ সালে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যখনা ঘটে পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে সেটি হলো টাঙ্গাইল উপ-নির্বাচন। এর আগে টাঙ্গাইলের কেন্দ্র থেকে মওলানা ভাসানী নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু মওলানা ভাসানী নির্বাচনের রিটার্ন দাখিল না করার জন্যে ট্রাইবুন্যাল তাঁর নির্বাচন বাতিল করে দেন এবং তাঁকে নির্বাচনের অযোগ্য বলে ঘোষণা করেন। তারপর ঐ কেন্দ্রে যখন উপ-নির্বাচন হয় তখন ঐ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করেন আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক। আওয়ামী মুসলিম লীগের তখনও জন্ম হয়নি। সুতরাং একজন ছাত্রনেতা এবং গনতান্ত্রিক যুব লীগের নেতা হিসাবেই শামসুল হক সাহেব এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দি ছিলেন খুররম খান পন্নী। এ নির্বাচনের একটি সুন্দর কাহিনী আছে। এই উপ-নির্বাচনে মুসলিম লীগ দল, সরকারী দল হিসাবে খুররম খান পন্নীকে সমর্থন করে এবং তার নির্বাচনে প্রচার অভিযান চালায়। অপরপক্ষে গণতান্ত্রিক যুবলীগের সদস্যরা এবং তখন মুসলীম লীগের মধ্যে যারা বামপন্থী বলে চিহ্নিত ছিলেন তাঁরা জনাব শামসুল হককে সমর্থন করেন। আর একজন জনাব শামসুল হককে সমর্থন করেন যা ছিলো সকলের পক্ষে অচিন্তনীয়। তিনি হলেন জনাব খুররম খান পন্নীর স্ত্রী। তিনি জনাব পন্নীর বিরুদ্ধে প্রচারপত্র বিলি করে জনাব শামসুল হককে সমর্থন করেন। এই উপ-নির্বাচনে জনাব শামসুল হক বিপুল ভোটে জনাব খুররম খান পন্নীকে পরাজিত করেন। তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের মাটিতে পাকিস্তান হওয়ার পরে মুসলিম লীগের এটিই হলো প্রথম শোচনীয় পরাজয়।

বিভিন্ন আন্দোলন, বিভিন্ন ধর্মঘট বিভিন্ন বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে যে শক্তির জন্ম হচ্ছিল সে শক্তি স্বভাবতই মুসলিম লীগ থেকে ভিন্নতর একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কামনা করছিল। তারই ফলে ১৯৪৯ সালের ২৩২শে ও ২৪শে জুন মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে রোজ গার্ডেনে পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগ কর্মীদের এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের প্রস্তুতির কালে একটা গুজব রটে যায় যে, মওলানা ভাসানীকে গ্রেফতার করা হয়। সেজন্য ২৩শে জুন তারিখেই মোশতাক আহমদ ও অন্যান্যরা মওলানা ভাসানীকে একটি ঘোড়ার গাড়ীতে করে গোপনে রোজ গার্ডেনে হাজির করেন। এ সময়ে এই আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্মের জন্যে জনাব কাজী বশিরের যে অবদান তাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

এই সম্মেলনে ৪০ জন সদস্যকে নিয়ে মওলানা ভাসানীর প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি হন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। সাধারণ সম্পাদক হন, জনাব শামসুল হক এবং যুগ্ম সম্পাদক হন শেখ মুজিবুর রহমান ও খোন্দকার মোশতাক আহমদ। এই সম্মেলনের পর ২৪শে জুন তারিখে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে আরমানিটোলা ময়দানে সর্ব প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম

লীগের এই জনসভায় কয়েক হাজার লোক উপস্থিত ছিলো। এই জনসভায় মুসলিম লীগের পান্ডারা আলাউদ্দিন ও ইবরাহীমের নেতৃত্বে হামলা চালায় এবং টেবিল চেয়ার চুরমার করে দেয়। এতদসত্বেও সভাটি অনুষ্ঠিত হয় এবং সভাশেষে আওয়ামী মুসলিম লীগ সংগঠনের ঘোষণা দেয়া হয়।

১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর থেকে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে আর একটি ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠেছিল। এই ষড়যন্ত্রটি হলো আরবী হরফে বাংলা লেখার ষড়যন্ত্র। ১৯৪৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে পেশোয়ারে পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সভা হয়। এই সভাতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ফজলুর রহমান আরবী হরফে বাংলা লেখার যুক্তি দেখিয়ে বক্তৃতা করেন। জনাব ফজলুর রহমানের এই হীন প্রচেষ্টা বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। ছাত্রদের প্রতিবাদ সভা হয়। সভাশেষে ছাত্রদের প্রতিনিধ দল ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, আরবী হরফে বাংলা লেখার অর্থ হলো বাংলা ভাষার অপমৃত্যু। এসময়ে ছাত্রদের সমর্থন করেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, সৈয়দ আলী আশরাফ, সৈয়দ আলী আহসান, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন ও অন্যান্য শিক্ষাবিদরা। পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের অধিকাংশ সদস্য স্বীকার করেন যে, আরবী হরফে বাংলা লেখা চলতে পারে না এবং এসম্পর্কে তাঁরা ছাত্রদের সাথে একমত হন। এই সঙ্গে এটাও তাঁরা প্রকাশ করেন যে আরবী হরফে বাংলা লেখার তাঁরা বিরোধী। '৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আরবী হরফে বাংলা লেখার প্রতিবাদে সভা সমিতি অনুষ্ঠিত হয় সারাদেশ ব্যাপী।

বলা দরকার, এ সময়ে এদেশে রাজনৈতিক বা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আরেকটি ধারা সৃষ্টি হতে যাচ্ছিলো। '৪৭-এর পর থেকেই এদেশে একটি অসাম্প্রদায়িক ছাত্র ও রাজনৈতিক সংগঠনের গুরুত্ব অনেকেই অনুভব করছিলেন। গণতান্ত্রিক যুবলীগ যদিও একটি অসাম্প্রদায়িক যুব প্রতিষ্ঠান ছিল, কিন্তু যেহেতু গণতান্ত্রিক যুবলীগ বেশীদিন কাজ করতে পারেনি, সেহেতু যুবলীগ এদেশের যুবক বা ছাত্রদের মানসিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়নি। '৪৮ সালে যখন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের জন্ম হয়, তখন ঢাকাতে জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা, জনাব অলি আহাদ, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ প্রমুখরা চেষ্টা করেছিলেন 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ'কে অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠন করতে। কিন্তু যেহেতু ছাত্র প্রতিষ্ঠানটি মুসলিম ছাত্রলীগ নাম নিয়ে জন্ম নিলো, সেহেতু জনাব তোয়াহা, তাজউদ্দিন প্রমুখরা 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে'র সংগে আর কোনও সম্পর্ক রাখলেন না। '৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিম্ন-কর্মচারী ধর্মঘটকালে যখন দেখা গেল 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে'র নেতৃত্বে একটি অংশ আন্দোলনের সংগে সম্পর্ক ছেদ করে কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁরা প্রগতিশীল ছাত্র ছিলেন এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের যাঁরা বামঘেষা ছাত্রকর্মী ও নেতা ছিলেন তাঁরা পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সংগে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। এই দুই গ্রুপ চিন্তা করতে থাকেন একটি অসাম্প্রদায়িক যুব প্রতিষ্ঠান বা ছাত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় কিনা। এবং সে প্রচেষ্টারই প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ইউনিয়নগুলিতে গ্রুপ হিসেবে কিছুটা সংঘবদ্ধ হবার চেষ্টা করেন। এখানে বলা যেতে পারে তখন ছাত্রদের মধ্যে দু'টি দলই ছিল—একটি জনাব শাহ্ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বাধীন 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' এবং অন্য দল ছিল 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ'। অপর যে গ্রুপ বা দলটি গড়ে উঠলো একে তৃতীয় শক্তি

হিসেবে ধরা যেতে পারে। এই তৃতীয় শক্তিটি প্রথম যে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন তা হলো, '৫০ সালের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন। সেখানে 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগে'র থেকে চেষ্টা হয় কাজী গোলাম মাহবুবকে সহ-সভাপতি করে তার নেতৃত্বাধীন প্যানেল দেয়া। কিন্তু অলি আহাদ, খোন্দকার গোলাম মোস্তফা এবং আমরা এই প্যানেলের বিরোধিতা করি। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ১৩৮ নং কক্ষে এজন্য একটি সভা হয়। সভায় বাক-বিতণ্ডা হয়। আমরা তৃতীয় গ্রুপ পূর্ব থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কোনও অবস্থাতেই মুসলিম ছাত্রলীগের কোনও সদস্যকে এই নির্বাচনে সমর্থন করা হবে না। বাক-বিতণ্ডার পর ভোটাভুটি হয়। ভোটে কাজী গোলাম মাহবুব হেরে যান। ফলে মুস্তফা নূরুল ইসলামকে (বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক) নমিনেশন দেয়া হয়। তিনি আমাদের তৃতীয় শক্তিরই মুখপাত্রদের একজন ছিলেন। '৪৭ সালে গণতান্ত্রিক যুবলীগ প্রতিষ্ঠায়ও তাঁর বিশেষ অবদান ছিল।

জনাব মুস্তফা নূরুল ইসলাম আগে থেকেই বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সংগে জড়িত ছিলেন। মুস্তফা নূরুল ইসলামের সংগে নির্বাচনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে'র পক্ষ থেকে নির্বাচন প্রার্থী সৈয়দ মকসুদ আলীর। তিনি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। যদিও 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে'র সংগে আমাদের বরাবরই একটা মৈত্রী জোট ছিল, তথাপি দেখা গেলো মুসলিম হলের এই নির্বাচনে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে'র একটি বিশেষ অংশ জনাব মুস্তফা নূরুল ইসলামকে ভোটদানে বিরত থাকে এবং পরোক্ষভাবে কেউ কেউ 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগে'র মনোনীত প্রার্থী জনাব সৈয়দ মকসুদ আলীকে সমর্থন দেন। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফফে দেখা গেল বামপন্থী শক্তিরই জয় হয়েছে অর্থাৎ মুস্তফা নূরুল ইসলাম জয়লাভ করলেন। এটিই হলো বিশ্ববিদ্যালয় বামপন্থী ছাত্রদের প্রথম জয়লাভ। ঠিক একইভাবে ফজলুল হক মুসলিম হলেও এই তৃতীয় শক্তি নির্বাচনে অবতীর্ণ হয় এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা সেখানে পরাজিত হন এবন নির্বাচিত হন 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে'র তরফ থেকে প্রার্থী জনাব মোসলেম উদ্দীন তালুকদার। মোসলেম উদ্দীন তালুকদার অবশ্য বাজেট রাখতে পারেননি।তার বাজেট ফেল হয়ে যায় সুতরাং তার কেবিনেটও ভেঙ্গে যায় সেদিক থেকে বলতে গেলে বামপন্থী শক্তি অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় শক্তি ফজলুল হক হলেও তাদের নিজেদের আসন বা অবস্থান কিছুটা জোরদার করে।

অনুরূপভাবে ১৯৫১ সালে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের নির্বাচনে ত্রিমুখী লড়াই হয়। তৃতীয় শক্তির মনোনীত সহ-সভাপতি পদ-প্রার্থী ছিলেন হাবিবুর রহমান শেলী (বর্তমানে সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি) 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে'র প্রার্থী ছিলেন আনোয়ারুল হক চৌধুরী। এই নির্বাচনে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের পক্ষ থেকেও একজন প্রার্থী ছিলেন। নির্বাচনে হাবিবুর রহমান শেলী নির্বাচিত হন। কিন্তু যখন হলের বাজেট পেশ করা হয় তখন 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' এবং 'পূর্ব পাকিত্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' জোট বেঁধে সে বাজেট ফেল করিয়ে দেয়। ফজলুল হক হলে যে নির্বাচন হয় তাতেও তৃতীয় শক্তির জয় হলো। ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন বদিউল আলম। এবং সাধারণ সম্পাদক হলেন জনাব মোশাররফ হোসেন। এর পরবর্তীকালেও দেখা যায় যে, ফজলুল হক মুসলিম হলের নির্বাচনে ভাইস প্রেসিডেন্ট হন আনোয়ারুল হক খান। সুতরাং দেখা যায় যে, এ সময় থেকে 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগও 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে'র বাইরে যে প্রগতিশীল বামপন্থী

দলটি অর্থাৎ তৃতীয় শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধীরে ধীরে তাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করে। এই কয়েকটি নির্বাচন ফজলুল হক হলের এবং মুসলিম হলের নির্বাচন এই তৃতীয় শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক যুব প্রতিষ্ঠান বা যুব সংগঠন গড়ে তোলার জন্যে। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, ১৯৪৯ সালে নিম্ন-কর্মচারী ধর্মঘটে যাদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, বিশেষ করে বহিষ্কার আদেশ হয়েছিল, তাদের ওপর থেকে বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহৃত হলেও জনাব অলি আহাদকে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরত আসতে দেয়া হয়নি। যদিও তিনি বি-কম পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন, কিন্তু তথাপি তাকে এমকম-এ ভর্তি হতে দেয়া হয়নি। অনুরূপভাবে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকেও যখন বলা হলো একটি বণ্ড দেয়ার জন্যে, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে শেখ মুজিবুর রহমানকেও আর আইন বিভাগে ভর্তি করা হয়নি। জনাব অলি আহাদ যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন না, তথাপি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনের সংগে জড়িত ছিলেন এবং সংগঠন গড়ে তোলার জন্যে চেষ্টা করছিলেন। এ সম্পর্কে আমি পরে বলছি। কিন্তু তার আগে দেশে যে ঘটনাগুলো ঘটে সে ঘটনাগুলো সম্পর্কে আলোচনা না করলে ভুল হবে। কারণ সে ঘটনাগুলোই অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী শক্তিকে একটু বেশী করে প্রভাবিত করে।

১৯৪৯ সালের শেষের দিকে সারা পূর্ববঙ্গে বিশেষ করে ময়মনসিংহ, সিলেট, খুলনা, যশোর এবং রাজশাহীতে আন্দোলন জোরদার হয়। ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে কমরেড মনি সিং এবং নগেন শেঠের নেতৃত্বে হাজংদের বিদ্রোহ দেখা দেয়। খুলনা, কালশিরা, শোভন এই সমস্ত এলাকায় বিষ্ণু চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। যশোরেও ঠিক অনুরূপভাবে মোদাচ্ছের মুন্সী, নূর জালাল, অমলসেন, হেমন্ত সরকার ও কমরেড আব্দুল হক এঁদের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ সাঁওতাল বিদ্রোহের রূপ নেয়। ১৯৪৯ সালে শেষের দিক থেকে '৫০ সালের প্রথম পর্যন্ত যশোর, ময়মনসিংহ, খুলনা এবং বিশেষ করে রাজশাহীতে কৃষকদের ওপর ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার যে অত্যাচার করেছিলেন তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ৫০ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে ইলা মিত্রকে গ্রেফতার করার পর তার ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছিল, যে পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছিল সে সময় তা সারা পূর্ববঙ্গে প্রচারিত হয় এবং তার ফলে সারা পূর্ববঙ্গে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি ছাত্র ও যুব সমাজের মনে ধিক্কার ও ঘৃণা জন্মাতে শুরু করে। বিশেষ করে যারা বুদ্ধিজীবী, যারা প্রগতিশীল ছাত্র, শিক্ষক ছিলেন তাদের মনে। ইলা মিত্রের ওপর যে অত্যাচার করা হয় তা প্রচারপত্র আকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ও ঢাকা শহরে আমরা বিলি করেছি।

৫০ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে আরেকটি ঘটনা ঘটে। যশোর, রাজশাহী, খুলনা এ সমস্ত এলাকায় ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার যে আক্রমণ চালায় বিশেষ করে হিন্দু কৃষকদের ওপরে, তার একটি প্রতিক্রিয়া ঘটে পশ্চিমবঙ্গে। একটি কথা বলা যেতে পারে এ প্রসঙ্গে যে, এক নাচোলে যে কৃষক সংগ্রাম হয়েছিল সে উপলক্ষে ধৃত যে সমস্ত কৃষক বন্দী ছিল, পুলিশ জেরা করার সময় তাদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করার চেষ্টায় প্রায় ২৫ থেকে ৩০ জনকে পিটিয়ে হত্যা করে। এ সমস্ত ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে প্রচারিত হয় এবং একটু অতিরঞ্জিতভাবে প্রচারিত হলে সেখানে দাঙ্গা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং ঢাকায় তখন বলা যেতে পারে সর্বকালের বৃহত্তম দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। এই দাঙ্গা শুরু হয় ৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ১০ তারিখে। নবাবপুর, ইসলামপুর, পাটুয়াটুলি, লক্ষীবাজার, বনগ্রাম

এই সমস্ত এলাকাতে দাঙ্গা ভয়াবহ আকার নেয় এবং বহু হিন্দু এ দাঙ্গায় নিহত হয়। এ দাঙ্গায় প্রথম দিনে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে একটি ছাত্রদল দাঙ্গা বিরোধী মিছিল বের করে। এ মিছিলে খালেক নেওয়াজ খান-এর নেতৃত্বে 'পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগে'র কয়েকজন ছাত্র বের হয়। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররাই বেশীর ভাগ ডঃ গোলাম মওলার নেতৃত্বে যোগ দেন। ফজলুল হক মুসলিম হল থেকেও কিছু ছাত্র জনাব মোশাররফ হোসেন, জনাব আব্দুল মোমিন (পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের খাদ্যমন্ত্রী) এঁদের নেতৃত্বে যোগ দেন। এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে আমার বিশেষ করে মনে পড়ে (তখন আমি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্র ছিলাম) মাত্র ৭ থেকে ৮জন ছাত্র এই দাঙ্গা বিরোধী মিছিলে এসে আমাদের সঙ্গে সামিল হয়। তার মধ্যে ছিলেন সৈয়দ মোহাম্মদ আলী, রুহুল আমিন কায়সার, গোলাম কিবরিয়া, খন্দকার গোলাম মোস্তফা, সাদেক আলী খান, নাজির হোসেন এবং আমি। বাকী ২/৩ জনের নাম মনে পড়ছে না। কিন্তু একটি ঘটনা মনে পড়ে, যখন আমরা দাঙ্গা বিরোধী মিছিলে যোগ দেবার জন্যে বের হচ্ছিলাম তখন 'পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে'র কিছু ছাত্র এবং 'নিখিল পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' বাধা দেয়। পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কিছু ছাত্র রুহুল আমিন কায়সারকে হিন্দুর দালাল বলে মারবার জন্যে উদ্যত হয়। আমাদের হস্তক্ষেপে রুহুল আমিন রক্ষা পান। প্রচন্ড বাধা সত্ত্বেও আমরা এই দাঙ্গা প্রতিরোধ করবার জন্যে একটি দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করি। একটি শান্তি কমিটিও গঠন করা হয়। এই শান্তি কমিটির সভাপতি হন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, প্রফেসর মাহমুদ, ডঃ নূরুল হুদা, অধ্যাপক নজমুল করিম এবং আরো অনেকেই এ কমিটিতে ছিলেন।

শান্তি কমিটির উদ্যোগে ১২ই ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় যখন বক্তারা দাঙ্গার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন হঠাৎ একজন শান্তিনিকেতনী কবির নেতৃত্বে 'নিখিল পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে'র কিছু ছাত্র এই সভায় আক্রমণ চালায়। সেদিন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন তা স্মরণযোগ্য এই জন্যে যে, এতো উত্তেজিত ভাষা এতো তীক্ষ্ণভাবে এবং ধিক্কার দিয়ে তিনি আর কোনদিন ব্যবহার করেছেন বলে আমার মনে হয় না। দাঙ্গা সমর্থকদের হটিয়ে দেবার পর ডঃ শহীদুল্লাহ টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়ালেন এবং দাঁড়িয়ে থেকে চ্যালেঞ্জের সাথে বললেন, "আমি কোরাণ হাদিস পড়েছি, আমি চ্যালেঞ্জ করছি কেউ যদি কোরাণ কিংবা হাদিস থেকে দেখাতে পারে যে নিরীহ এবং নিরস্ত্র হিন্দুদেরকে হত্যা করা পুণ্যের কাজ তবে আমি তার দাসত্ব স্বীকার করবো।" সেদিন মনে হয়েছিল এই খর্বকায় ব্যক্তিটির মাথা যেন আকাশ ছুঁয়ে আছে। বাতাসে চুলগুলো উড়ছিল। তাঁর সেদিনের সে চেহারাটা স্পষ্ট এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। এই দাঙ্গা উপলক্ষে আরেকটি ঘটনা ঘটে। দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য শান্তি কমিটি গঠনের জন্য সিলেটে মাহমুদ আলী সাহেবকে গ্রেফতার করা হয়। এবং তার দুদিন পরে মাহমুদ আলীকে গ্রেফতার করার প্রতিবাদ করার জন্যে জনাব মোতস্‌সের আলীকেও গ্রেফতার করা হয়।

পূর্ব-পাকিস্তানের বামপন্থী শক্তি এবং পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে যারা রাজনীতির বিষয়ে চিন্তা করতেন তাদের জন্যে এটাছিল একটি শিক্ষা। সরকার দাঙ্গায় উস্কানী দেয় এবং দাঙ্গার স্বপক্ষে সরকারের ভাড়াটিয়া ছাত্রদল প্রচার করে, এ ঘটনা থেকে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান, সে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই হোক বা ছাত্র প্রতিষ্ঠানই হোক তার প্রতি পূর্ব-বাংলার যুবকদের একটা মোহমুক্তি ঘটে বা ঘটতে শুরু হয়।

মার্চ মাস থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর একটি ঘটনা ঘটে, তাহলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন। এই আন্দোলনটি 'নো ফি ক্যামপেইন' নামে খ্যাত। এই আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বেতন বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে এবং এই আন্দোলনে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, যতদিন বেতন কমানো না হবে ততদিন তারা বেতন দেবে না। বেতন প্রায় দ্বি-গুণ বাড়ানো হয়েছিল। এই আন্দোলনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছুটা নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে। বেতন কিছুটা কমানো হয়। এ আন্দোলন আংশিক সাফল্য লাভ করে। এর পরপরই এ আন্দোলনকে ভিত্তি করেই একটা শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে যাঁরা নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাদের মধ্যে বিশেষ করে সিলেটের জনাব তাসাদ্দুক, জনাব তোয়াহা, জনাব আব্দুল মতিন, জনাব অলি আহাদ, জনাব মুস্তফা নূর-উল ইসলাম, রুহুল আমিন কায়সারের নাম উল্লেখ্য। এ শিক্ষা সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা, শিক্ষার বাহন কি হওয়া উচিত, শিক্ষার মাধ্যম কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে আলোচনা করা। ছাত্রদের আর্থিক সমস্যা, ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা, ছাত্রদের স্কুল, কলেজ ইত্যাদির সমস্যা, এসব নিয়েও আলোচনা করার জন্যে এই শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই শিক্ষা সম্মেলনটি আহ্বান করা হয়েছিল এপ্রিল মাসের দিকে। এবং সম্মেলনের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরী হল। যেদিন শিক্ষা সম্মেলন শুরু হবে ঠিক সেই দিন নিখিল পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কিছু নেতৃস্থানীয় লোক এবং তাদের কিছু ভাড়াটিয়া গুন্ডা সেই হলে ডেলিগেটদের ওপর হামলা চালায়। যার ফলে ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরী হলে এই শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত করা সম্ভবপর হয়নি। আমাদের চলে আসতে হয় ফজলুল হক মিলনায়তনে এবং সেখানেই শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই শিক্ষা সম্মেলনে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয় তার মধ্যে অন্যতম ছিল বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা এবং অবিলম্বে শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা। স্কুল, কলেজ, বিশেষ করে আই-এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করার জন্যে উদ্যোগ নেয়ার দাবী জানিয়েও প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনে ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদ করেও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনে দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা করে আরেকটি প্রস্তাব নেয়া হয় এবং নাচোলে ও খুলনায় কৃষকদের ওপরে যে অবর্ণনীয় অত্যাচার করা হয় তার বিরুদ্ধে, তাকে নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। নাদিরা বেগমসহ সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করা হয়। এখানে বলা প্রয়োজন, এর কিছুদিন আগে নাদিরা বেগম গ্রেফতার হয়েছিলেন। এবং তিনি জেলে বিচারাধীন ছিলেন। সে সময় জেলে একটি অনশন ধর্মঘটও চলছিল। এখানে একটি কথা বললে অবশ্য ভুল হবে না যে, তখন ইলা মিত্রের ওপর অত্যাচারের কাহিনী সারা পূর্ববঙ্গে প্রচারিত হয়ে তাঁর প্রতি যেমন সহানুভূতির সৃষ্টি করেছিল সাধারণ মানুষের মনে, তেমনি নাদিরা বেগম প্রথম মুসলিম মহিলা যিনি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্বদানের জন্যে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, তার জন্যেও এদেশের ছাত্র ও তরুণ সমাজের মনে একটি শ্রদ্ধার আসন পাতা হয়েছিল। তিনি সে সময়ে ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রেরণার উৎস ছিলেন, একথাটা বললে হয়তো ভুল বলা হবেনা।

৫০ সালের শিক্ষা সম্মেলনের পর পরই এক মর্মান্তিক ঘটনা রাজশাহী জেলে অনুষ্ঠিত হয়। ঘটনাটি ঘটে ৫০ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে। রাজশাহী জেলে সেদিন খাপরায় (যেখানে রাজবন্দীদের আটক রাখা হয়েছিল) রাজবন্দীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালানো হয়। সেই গুলিতে সাতজন শহীদ হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন আনোয়ার, দেলোয়ার হোসেন, হানিফ, বিজন সেন, কম্পরাম, সখেন ভট্টাচার্য ও সুধীন ধর। এ ছাড়া যাঁরা গুলিতে আহত হয়েছিলেন তাঁদের

মধ্যে ছিলেন মনসুর হাবীব, নূরুন্নবী চৌধুরী, আব্দুল হক, অমূল্য লাহিড়ী, রশীদ, আব্দুস শহীদ, আমিনুল ইসলাম, আয়ুব আলী এমনি প্রায় ৩১ জন রাজবন্দী। খুলনা জেলে এ সময় বিষ্ণু বৈরাগীকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

ঢাকা জেলে রাজবন্দী শিবেন রায় এবং ফণী গুহকে হত্যা করা হয়। যশোর জেলে মোজাম্মেলকে গলাটিপে মারা হয়। এসব ঘটনা ধীরে ধীরে জনসাধারণে প্রচারিত হতে থাকে সকল প্রকার বাধা নিষেধের বেড়াজাল অতিক্রম করে। ফলে সরকারের নির্মম অত্যাচার এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিরুদ্ধে ছাত্র, শিক্ষক জনতার মনে যে ঘৃণার উদ্রেক হয়, তা থেকে পরবর্তীকালে একটি অসাম্প্রদায়িক সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানের চিন্তাভাবনা সবাই করতে থাকেন।

১৯৫০ সালের প্রথম দিকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়। জনাব আব্দুল মতিনকে এর আহ্বায়ক করা হয়। জনাব আব্দুল মতিনের নেতৃত্বে এ সংগ্রাম কমিটি ১৯৫০ সালের ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করেন। এই কমিটিরই উদ্যোগে ১৯৫১ সালের ১১ই মার্চে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হয়।

১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে লিয়াকত আলী খান ঢাকায় আসেন। তাঁর আগমনকে কেন্দর করে ১৯৪৯ সালের ১১ই অক্টোবর আরমানিটোলা ময়দানে আওয়ামী মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সে সময়ে পূর্ববঙ্গে দুর্ভিষ অবস্থা বিরাজমান ছিল এবন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য একটি ভুখা মিছিল বের করবার উদ্দেশ্যেই সে সভাটি আহূত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। সভায় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, জনাব শামসুল হক, জনাব শেখ মুজিবর রহমান বক্তৃতা করেন। সভাশেষে একটি ভুখা মিছিল বের হয় এবং নাজিরা বাজারে রেলওয়ে ক্রসিং-এর কাছে এলে পুলিশ বাধা দেয়। মিছিলটি আবার ফিরে রেলওয়ে ষ্টেশনের পাশ দিয়ে যখন নবাবপুর রেলক্রসিং-এর দিকে যেতে থাকে, সেখানে পুলিশ লাঠি চার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। জনাব জনাব শামসুল হকসহ এগারোজনকে গ্রেফতার করা হয়। ১৪ই অক্টোবর মওলানা ভাসানীকে কারকুনবাড়ী লেনস্থ ইয়ার মোহাম্মদ সাহেবের বাড়ী থেকে গ্রেফতার করা হয়। তার পরদিনই জনাব শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে আনোয়ারা খাতুনের বাড়ী থেকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে গ্রেফতার হওয়ার পরে জনাব শেখ মুজিবুর ১৯৫২ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে আটক ছিলেন। ফলে, স্বাভাবিক কারণেই '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই এদেশের ছাত্র জনসাধারণ একটি নতুন সংগঠনের কথা চিন্তা করতে থাকে। পরবর্তীকালে তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ 'পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগে'র জন্ম ১৯৫১ সালের ২৭শে ও ২৮শে মার্চে। পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের জন্ম হয় বুড়ীগঙ্গা নদীর বক্ষে ভাসমান নৌকার উপর। কারণ, ঢাকা শহরে সম্মেলনের উপর পুলিশের হামলা হতে পারে এ আশঙ্কা ছিল। সুতরাং যুব সম্মেলনকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য এ ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সে কারণে বুড়ীগঙ্গা নদীর বুকের উপর নৌকার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের ঐতিহাসিক জন্ম। যুবলীগের প্রথম সভাপতি হন জনাব মাহমুদ আলী, সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা, সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ, যুগ্ম সম্পাদক জনাব ইমাদুল্লাহ এবং জনাব মোহাম্মদ সুলতান। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে যুবলীগের যে বিরাট অবদান ছিল একথা আজ সর্বজন-স্বীকৃত। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে আসবার

আগে ১৯৫১ সালে ১১ই মার্চে যে রাষ্ট্রভাষা দিবসটি প্রতিপালিত হয় সেদিনের একটি কৌতুককর ঘটনা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। ঘটনাটি মনে হলে এখনো হাসি পায়।

১৯৫১ সালের ১১ই মার্চের হরতালে বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ছাত্র অংশগ্রহণ করেন এবং সব ছাত্রই ধর্মঘটে যোগ দেন। শুধুমাত্র ১ জন ছাত্র এ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন—তিনি ক্লাশে বসে থাকেন। ছাত্রটি ছিলেন সে সময়কার কলা অনুষদের ডীন ডঃ সাদানীর ভাইয়ের ছেলে। তাঁকে প্রথমে ক্লাশ করা থেকে বিরত থাকার জন্য চেষ্টা করা হলো। তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না। পরবর্তীতে তাঁকে ডেকে আনা হলো মধুর রেস্তোরাঁতে। সেখানে মতিন সাহেবসহ সবাই আমরা ছাত্র ঐক্যের প্রশ্নে আমাদের সঙ্গে ধর্মঘটে অংশ নেয়ার জন্য তাকে অনুরোধ জানালাম। কিন্তু সে কোনও যুক্তিই মেনে নিতে রাজী নয়। এমন সময় হঠাৎ আমাদের সকলের মাঝখান দিয়ে কবি হাসান হাফিজুর রহমান লাফ দিয়ে টেবিলের উপর উঠে দাঁড়ালেন এবং টেবিলের ওপর দাঁড়িয়েই তাঁর পায়ের থেকে স্যাণ্ডেল খুলে দমাদম সেই ছেলেটির দু'গালে লাগিয়ে দিলেন। আর ঠিক তখনই জনাব নূরুন্নবী (যিনি বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টের এ্যাডভোকট) ডক্টর সাদানীর ভাইয়ের ছেলেকে চেপে ধরলেন এবং তাকে মাটিতে ফেলে বুকে চড়ে বসে ছেলেটিকে ঝাঁকি দিতে বললেন, "বল, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।" ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা সবাই হতচকিত হয়ে গিয়েছিলাম। সংগে সংগে মতিন সাহেবসহ আমরা সকলে নূরুন্নবীর কবল থেকে ডক্টর সাদানীর ভাইয়ের ছেলেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে কিছুটা সান্ত্বনা দিই। ছেলেটি আর ক্লাশে যায়নি। ধর্মঘট পুরোপুরিভাবেই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। জনাব হাসান হাফিজুর রহমান এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারেন তা' অনেকেই হয়তো আজ বিশ্বাস করতে চাইবেন না। আকারে ছোটখাট মানুষটি, স্বভাবে কবি, আলাপ-আলোচনায় বিনয়ী, সদাহাস্যময় মুখ, এ লোকটি যে হঠাৎ ক্ষেপে উঠতে পারেন এবং কাউকে আক্রমণ করতে পারেন তা সত্যিই বিশ্বাস করা দুরূহ। কিন্তু আমি যদি কয়েকটি ঘটনার কথা বলি তবে অনেকেই জেনে বিস্মিত হবেন যে, এ ছোটখাট কবি মানুষটি দুরন্ত সাহসী ছিলেন। তিনি বহুবার ভয়-ভীতি তুচ্ছ করে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। মনে পড়ে, ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন দাঙ্গা-বিরোধী সভা হচ্ছিল। 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগে'র ছাত্ররা গুণ্ডাসহ সে সভা আক্রমণ করে। সে সময়ে হাসান হাফিজুর রহমান সাহেবই প্রথম শ্লোগান দেয়ার টিনের চোঙ নিয়ে তাদেরকে পাল্টা আক্রমণ করেন। তিনি দু'একজনকে সে চোঙ দিয়ে মারতে থাকেন। পরবর্তীকালে আমরা সকলেই তাঁর সাহায্যে এগিয়ে যাই। কিন্তু বরাবরই দেখা গেছে, জনাব হাসান হাফিজুর রহমান মারপিটের ব্যাপারে কিছুটা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, অবশ্য প্রয়োজনবোধে।

১৯৫১ সালের মাঝামাঝি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ৫৪ নং ঘরে একটি ছোট বৈঠক হয়। সেই রুমে আমিই থাকতাম। পাশের ৫২ নং ঘরে থাকতেন জনাব মাহবুব জামাল জাহেদী। তোয়াহা সাহেব, মাহবুব জামাল জাহেদী, অলি আহাদ, আবদুস সামাদ মিলে ছোট ঐ বৈঠকে যুবলীগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এবং তার কর্মতৎপরতা সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। এখানে একটি বিষয়ে আমরা একমত হয়েছিলাম যে, ভাষার দাবীর প্রশ্নে নীরবতা এবং আন্দোলন বিমুখতা কোনটাই সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সহায়ক নয়। সুতরাং এ অবস্থার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। আমরা আরও ঠিক করেছিলাম যে, বাংলাভাষা আন্দোলনকে সামনে রেখে আমরা আরো সক্রিয় হব। অবশ্য বাংলাভাষার আন্দোলন বোঝাতে তখন বোঝাতো ১১ই মার্চের আন্দোলন।

এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও একটি ঘটনা ঘটে। সেটি হল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পি সি চক্রবর্তীকে পূর্ববঙ্গ থেকে বহিষ্কারের নোটিশ প্রদান করেন। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এর প্রতিবাদ করি এবং ছোট একটি মিছিল বের করি। মিছিল শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে জনাব হাবীবুর রহমান শেলীর সভাপতিত্বে একটি সভা হয় এবং উক্ত সভায় শিক্ষকদের ওপর সরকারী হামলার নিন্দা করে একটি প্রস্তাব নেয়া হয়। কিন্তু ডক্টর পি সি চক্রবর্তীকে দেশ ছেড়ে যেতে সরকার বাধ্য করেন। আমরা তা ঠেকাতে পারিনি।

এরপর ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী।

সেদিন পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পল্টন ময়দানে এক ভাষণ দেন। বক্তৃতাকালে তিনি অযাচিত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে ঘোষণা করেন, "উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।" জনাব খাজা নাজিমুদ্দিনের এ বক্তৃতার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং ঢাকার অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ঢাকায় জনাব খাজা নাজিমুদ্দিনের এ বক্তৃতার প্রতিবাদে ৩০শে জানুয়ারী তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট আহবান করা হয় এবং সেদিন (৩০শে জানুয়ারী) বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় ছাত্রদের একটি প্রতিবাদ সভা হয়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে'র জনাব খালেক নওয়াজ খান (ইনি পরে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে নূরুল আমিনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিলেন)। সভাশেষে যখন মিছিল বের করার প্রস্তাব উত্থাপন করা হল তখন 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে'র কর্মীরা এবং নেতৃবৃন্দ মিছিল করার বিরোধিতা করলেন। কিন্তু তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগ্রামী ছাত্র-ছাত্রীরা সেদিন মিছিল বের করে। মিছিল ফুলার রোড দিয়ে ঘুরে বর্ধমান হাউসের (যেখানে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বাস করতেন—বর্তমানে বাংলা একাডেমী) সম্মুখ দিয়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ হয়। মিছিলের শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সমগ্র ঢাকা শহরে ছাত্র ধর্মঘটের আহবান জানানো হয় এবং ৪ঠা ফেব্রুয়ারীকে সফল করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দ বিশেষ তৎপর হন। যুবলীগের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীরা 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি'র পক্ষ থেকে ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেন। কেননা এটা লক্ষ্য করা যাচ্ছিলো যে জনাব খালেক নওয়াজ খানের নেতৃত্বে 'পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে'র কিছু সদস্য ৪ঠা ফেব্রুয়ারীতে মিছিল করার বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করবেন এ বিষয়টি সকলের নিকট পরিষ্কার হয়ে ওঠে। পূর্ব-পাকিস্তানে মুসলিম ছাত্রলীগের এ তৎপরতার জন্য ৩রা ফেব্রুয়ারী যুবলীগের নেতৃস্থানীয় কর্মীবৃন্দ এক বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, যাতে পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মীরা ৪ঠার মিছিলকে বানচাল করতে না পারে সেজন্য যুবলীগের কর্মীদের মধ্য থেকেই একজনকে ঐদিন সভায় সভাপতিত্ব করতে হবে, এবং আরও ঠিক হয় ঐ সভায় আমাকেই সভাপতিত্ব করতে হবে। আমার নাম প্রস্তাব করবেন জনাব এম আর আখতার (মুকুল) এবং এ প্রস্তাব সমর্থন করবেন জনাব কমরুদ্দীন শহুদ (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক—)। 'পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে'র পক্ষ থেকে কারো নাম প্রস্তাব করার পূর্বেই এ প্রস্তাবের কাজ ও সমর্থনের কাজটুকু শেষ করতে হবে। সভাপতি কাউকে বক্তৃতা দেয়ার সুযোগ না দিয়ে নিজেই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়ে মিছিল করবার জন্য ছাত্রদের নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন।

যুবলীগের কর্মীদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচী পালিত হল। মিছিল বিরোধী 'পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে'র সদস্যগণ যাতে কোনও প্রকার সুযোগ না পায় তার জন্য যুবলীগ ও অন্যান্য প্রগতিশীল ছাত্ররা বেশ তৎপর ছিলেন। মধুর রেস্তোরাঁ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় একটি ছোট টেবিল আনা হল। এ সময়ে একটি হাস্যকর দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। মধুর রেস্তোরাঁ থেকে টেবিলটি আনার পর চেয়ারে জন্য অপেক্ষা করছেন জনাব খালেক নওয়াজ খান। 'পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে'র অন্যান্য কর্মীরাও অপেক্ষা করছেন। চেয়ার এসে সভাস্থলে পৌছানোর আগেই এম আর আখতার (মুকুল) টেবিলের উপরে লাফিয়ে উঠে সভাপতি হিসেবে আমার নাম প্রস্তাব করে দিলেন। তিনি যখন সভাপতির নাম প্রস্তাব করছেন তার মতলব বুঝতে পেরে সৈয়দ নূরুল আলম, এম আর আখতার মুকুলের প্যান্ট ধরে টেনে নামাবার চেষ্টা করছিলেন। এ টানা হ্যাঁচড়ায় বেচারা মুকুলের প্যান্টের কয়েকটি বোতামই ছিঁড়ে যায় কিন্তু তা সত্ত্বেও জনাব এম আর আখতার (মুকুল) সভাপতি হিসেবে আমার নাম প্রস্তাবের কাজ সমাধা করেন। এর পরেই পুরো ছয় ফুট লম্বা জনাব কমরুদ্দীন শহুদ পায়ের আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে হেঁড়ে গলায় প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। জনাব এম আর আখতার (মুকুল) টেবিল থেকে নেমে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি সভাপতির আসন নিলাম। চেয়ারের জন্য অপেক্ষা করতে পারলাম না। টেবিলের ওপর লাফিয়ে উঠলাম এবং দু' মিনিট বক্তৃতা করেই মিছিলের কর্মসূচী ঘোষণা করলাম। সেদিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রায় দশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী জমায়েত হয়েছিলেন। এ দশ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর বিরাট মিছিল সমস্ত ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে এবং মিছিল শেষে বিশ্ববিদ্যালয় বেলতলায় এসে পুনরায় সমবেত হয়। সেখানে প্রদেশব্যাপী ২১শে ফেব্রুয়ারী ধর্মঘটকে সফল করার আহ্বান জানানো হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারীতে প্রদেশব্যাপী হরতালের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় ৩০শে জানুয়ারী ঢাকা মোক্তার বার লাইব্রেরীতে। ঐদিন মোক্তার বার লাইব্রেরীতে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদে'র একটি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। (৩০শে জানুয়ারীতেই মোক্তার বার লাইব্রেীতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠন করা হয়।) ইতিপূর্বে 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি'ই কাজ করে যাচ্ছিলেন।

এখানে অবশ্য একটি কথা না বলে পারছি না, কিছুদিন আগে কাজী গোলাম মাহবুব সাহেব এবং আতাউর রহমান খান সাহেবের দুটো সাক্ষাৎকার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সাক্ষাৎকার দুটোই আমি পড়েছি। ঐ সাক্ষাৎকারে জনাব মাহবুব ও জনাব আতাউর রহমান খান একটি বিষয়ে বলবার চেষ্টা করেছেন তা হ'ল ঢাকা 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' নামে কোনও কমিটির অস্তিত্ব ছিল না। আমার মনে হয়, তাঁরা অতীতের কথা ভুলে গেছেন অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির কর্মতৎপরতাকে বা কমিটির অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে চান, তা হ'লে তার জবাবে একটি কথাই বলব, তা হ'ল—কেন, কি কারণে, কি প্রয়োজনে এ সামান্য কথাটুকুর স্বীকৃতি না দেওয়া ? সত্য কথাটুকু বলতে এ কুণ্ঠাবোধ কেন ? বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটিকে অস্বীকার করে কি আজ তাঁরা একথা প্রমাণ করতে পারবেন যে, ২১শে ফেব্রুয়ারীতে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার স্বপক্ষে তাঁরা ছিলেন ? সুতরাং যেটুকু তাঁরা করেননি, করতে সাহস করেননি, সেটুকুকে চাপা দেয়ার জন্য যদি এ বক্তব্য পেশ করে থাকেন তবে আমি বলব এটি তাঁদের নিষ্ফল প্রয়াস। বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটি ছিল এবং এর আহ্বায়ক ছিলেন জনাব আব্দুল মতিন। বিশ্ববিদ্যালয়ে জনাব আব্দুল মতিন একারণেই রাষ্ট্রভাষা মতিন নামেই সবার কাছে পরিচিত ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ ঢাকা মোক্তার বার লাইব্রেরীতে যে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রম পরিষদ' গঠিত হয়, তাতে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ', 'খেলাফতে রাব্বানী', 'তমদ্দুন মজলিস', 'পূর্ব-পাকিস্তান যুবলীগ', 'পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' প্রভৃতি প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি ছিলেন। এ ছাড়া প্রতিটি হল থেকে দু'জন করে অর্থাৎ হল ইউনিয়নের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক এ পরিষদের সদস্য ছিলেন। জনাব আব্দুল মতিনকে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি'র আহ্বায়ক হিসেবেই ঐ সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির সদস্য করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ২০শে ফেব্রুয়ারীতে বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটির মুখপাত্র হিসেবেই তিনি তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে তাঁর মতামত জ্ঞাপন করেছিলেন। সুতরাং 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' নামে কোনও কমিটি ছিলনা বলে এ সত্যকে চাপা দেয়ার চেষ্টা বৃথা প্রয়াস মাত্র। ইতিহাসকে তার নিজের গতিতে চলতে দেয়া উচিত। সঠিক ইতিহাসকে ধরে রাখা উচিত নিজের বিবেকের জন্য ও উত্তরসুরীদের জন্য।

মোক্তার বার লাইব্রেরীতে ৩০শে জানুয়ারীতে যে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়, তার আহ্বায়ক নিযুক্ত হন জনাব কাজী গোলাম মাহবুব। এই তৎপরতাকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ১২ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারীকে 'পতাকা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হল। ঐ দুটো দিনে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থাও করা গেল। উক্ত দুটো দিন ঢাকার বুকে এবং নারায়ণগঞ্জে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়। শুধু অর্থ সংগ্রহই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলনা। ঐ দিন দুটিতে যে অর্থ সংগ্রহ হয়েছিল তা' যৎসামান্য, কিন্তু ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতি লগ্নে এটা একটা চমৎকার পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। এ পতাকা দিবসকে লক্ষ্য করে আরো নতুন নতুন কর্মী ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়ে। সে সময় ৫০০ পোস্টার লেখানোর দায়িত্ব দেওয়া হল নাদিরা বেগম এবং ডাঃ সাফিয়াকে। নাদিরা বেগম এবং ডাঃ সাফিয়া তাঁদের বান্ধবী ও অন্যান্য ছাত্রীদের নিয়ে পোস্টার লেখার ব্যবস্থা করেন।

এ সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটে। ১৯৫২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখ ভোরে জেলখানা থেকে পাচার হয়ে একটি গোপনীয় চিঠি আসে। সে চিঠিতে বলা হয় যে, জনাব শেখ মুজিবুর রহমান এবং জনাব মহিউদ্দীন আহমদ-এ দু'জন অনশন ধর্মঘট করছেন।

অনশন ধর্মঘটীদের মুক্তির দাবীর সঙ্গে অন্যান্য রাজবন্দীর মুক্তির দাবীর কথাও সে চিঠিতে উল্লেখ ছিলো। ১৮ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্রসভাতে 'বিশ্ববিদ্যালয় রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলন কমিটি' নামে ১৭/১৮ জন সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক করা হয় আমাকে। 'রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলন কমিটি'র সেই প্রথম সভাতে যাঁরা বক্তৃতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঃ জনাব জিল্লুর রহমান, নাদিরা বেগম এবং সামসুল হক চৌধুরী। ১৯শে তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী করা হয়। এখানে বলা আবশ্যক যে, পাকিস্তানের জন্মের পর এটিই ছিলো প্রথম রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলন কমিটি।

২০শে তারিখে তিনটির দিকে মধুর রেস্তোরাঁয় বসে আমরা যখন স্বেচ্ছাসেবকের তালিকা তৈরী করছিলাম তখন মাইকযোগে পূর্ববঙ্গ সরকারের তরফ থেকে ১৪৪ ধারা জারীর ঘোষণা করা হয়। ১৪৪ ধারা জারী করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এ সময় একটি গুজবও সরকারপক্ষীয় ছাত্রদের মধ্য থেকে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল ঃ হাসপাতালে নাকি অনেকগুলো বেড খালি করা হয়েছে। ২১শে ফেব্রুয়ারীতে যদি কোন শান্তি ভঙ্গ হয় তাহলে আহতদের যাতে হাসপাতালে ভর্তি করানো যায়, সেজন্যেই হাসপাতাল খালি করা হয়েছে। এ গুজব ছড়ানোর পেছনে বোধহয় উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করা।

কিন্তু দেখা গেলো ১৪৪ ধারা জারী বা এ গুজব ছড়ানোর জন্য ছাত্ররা বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয়নি। সন্ধ্যায় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে জনাব ফকির সাহাবুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। সভায় স্থির হয় যে, ১৪৪ ধারা মেনে নেয়া হবে না। ১৪৪ ধারা অমান্য করতে হবে। এবং এ সিদ্ধান্ত 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদে'র সভায় জানিয়ে দিতে হবে। অনুরূপভাবে ফজলুল হক মুসলিম হলেও জনাব আব্দুল মোমিন (পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের খাদ্যমন্ত্রী)-এর সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। ঐ সভাতেও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ১৪৪ ধারা মেনে নেওয়া চলবে না। ফজলুল হক মুসলিম হলে তখন সহ-সভাপতি ছিলেন জনাব শামসুল আলম এবং সম্পাদক ছিলেন জনাব আনোয়ারুল হক খান (পরবর্তীকালে যিনি বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন)। জনাব আনোয়ারুল হক খান এবং জনাব শামসুল আলম দু'জনেই ফজলুল হক হলের পক্ষ থেকে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে'র সদস্য ছিলেন। ফজলুল হক হলের ছাত্রসভায় জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ (বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি) প্রস্তাব আনেন যে, 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম-পরিষদ'কে জনাব আব্দুল মোমিন এবং জনাব শামসুল আলম ফজলুল হক হলের ছাত্রদের এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন।

২০শে তারিখে সন্ধ্যার পর নবাবপুর 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' অফিসে জনাব আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদে'র জনাব গোলাম মওলা, জনাব আব্দুল মতিন এঁরা সকলে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে জোর বক্তব্য রাখেন এবং এঁদের সমর্থন করেন ফজলুল হক মুসলিম হল ইউনিয়নের সহ-সভাপতি জনাব শামসুল আলম। জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা যদিও ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছিলেন কিন্তু যেহেতু কমিউনিষ্ট পার্টির সিদ্ধান্ত ভিন্ন রকম ছিল সেহেতু তিনি ভোটাভুটির সময় ভোট দানে বিরত থাকেন। ফলে ১১—৪ ভোটে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ সিদ্ধান্ত নেন যে, '১৪৪ ধারা ভাঙ্গা হবে না।' ভোটাভুটির পরও জনাব অলি আহাদ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "এ সিদ্ধান্ত আমরা মানি না এবং আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ছাত্রসভা হবে সে ছাত্রসভায় ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে যদি রায় হয়, তবে আমরা ভাঙ্গার পক্ষে।" জনাব অলি আহাদের বক্তব্য শুনে জনাব আবুল হাশিম রাগত স্বরে বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ছাত্র সভা হবে সে ছাত্রসভায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের পক্ষ থেকে জনাব শামসুল হক রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন এবং তিনি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের তরফ থেকে বক্তব্য পেশ করবেন। যদি তবুও ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গে তবে স্বাভাবিকভাবে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদে'র বিলুপ্তি ঘটবে।" জনাব আবুল হাশিমের এই বক্তব্যও প্রস্তাবাকারে গৃহীত হয়।

সেদিন ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার পক্ষে যাঁরা মত দিয়েছিলেন তাঁদের বক্তব্য ছিল যে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ একটি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলবে এবং অনিয়মতান্ত্রিক বা বেআইনী কোনও কাজে তাঁরা যাবে না। তাঁরা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গবেন না। কেন না, ১৪৪ ধারা যদি ভাঙ্গা হয় তবে সরকার নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ পাবে। ফলে, নির্বাচন পিছিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের যেসব রাজনৈতিক নেতা ছিলেন তাদের সম্মুখে রাষ্ট্রভাষার জন্য সংগ্রামের চাইতে পরিষদের নির্বাচন অনেক বেশী আকর্ষণীয় ছিল।আবার বলা যেতে পারে যে তাঁরা ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকারের নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাকে এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন। কমিউনিষ্ট পার্টিও তখন ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে ছিল না।'আওয়ামী মুসলিম লীগ যে দিকে চলবে সেদিকে হাল ধরা' এটুকুই ছিল তাদের

তখনকার রাজনৈতিক কর্মপন্থা। ১৪৪ ধারা যে ভাঙ্গা হবে না এ সম্পর্কে তারা তাদের কর্মীদের পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। পার্টির সিদ্ধান্তটুকু সন্ধ্যের দিকেই আমরা যাঁরা পার্টির সাথে যুক্ত ছিলাম তাদের হাতে আসে।

সেদিন রাতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের সিদ্ধান্ত '১৪৪ ধারা ভাঙ্গা হবে না' এ সংবাদটুকু পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন হলে যোগাযোগ করা হলো। রাত প্রায় বারোটার দিকে ফজলুল হক হল ও ঢাকা হলের মাঝখানে যে পুকুর আছে তার পূর্ব ধারের সিঁড়িতে বিভিন্ন হলের নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের নিয়ে, ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য এবং ২১শে ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচী স্থির করার জন্য আমরা এক বৈঠকে মিলিত হই। এ বৈঠকে জনাব হাবিবুর রহমান (শেলী) বর্তমানে হাইকোর্টের বিচারপতি, জনাব মোহাম্মদ সুলতান (যুবলীগের সম্পাদক), জনাব জিল্লুর রহমান (আওয়ামী লীগের প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারী), জনাব আবদুল মোমিন (আওয়ামী লীগের প্রাক্তন খাদ্যমণ্তরী), জনাব এস এ বারী এটি,(ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক মশিয়ুর রহমান গ্রুপ, জনাব এম আর আখতার (মুকুল), জনাব কমরুদ্দিন শহুদ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক), জনাব আনোয়ারুল হক খান (ফজলুল হক হলের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক), জনাব আনোয়ার হোসেন (খুলনা থেকে আগত বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার একজন ছাত্র) সহ আমরা এগারজন উপস্থিত ছিলাম। এক জনের নাম আজ স্মরণ করতে পারছি না। ঐ বৈঠকে স্থির হলো যে, যে কোন মূল্যেই হোক আমরা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গবোই। ১৪৪ ধারা ভাঙ্গতে গিয়ে আমাদের কতকগুলো কৌশলগত কাজ করতে হবে। আমরা একটা কথা গভীরভাবে ভাবছিলাম যেহেতু আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার বিপক্ষে সেহেতু যদি পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কোন সদস্য বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ২১শে ফেব্রুয়ারীর ছাত্রসভায় সভাপতিত্ব করেন তবে তিনি হয়ত ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার বিপক্ষে মতামত দিতে পারেন এবং ফলে একটা বিভ্রান্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হতে পারে। সেজন্যে বৈঠকে প্রথমেই স্থির করা হোল আমাকেই আমতলার সভায় সভাপতিত্ব করতে হবে; কিন্তু সভা অনুষ্ঠানের পূর্বেই যদি আমি গ্রেফতার হয়ে যাই তবে সভাপতিত্ব করবেন এম আর আখতার (মুকুল) এবং তাঁরও গ্রেফতারকৃত অপারগতায় সভাপতিত্ব করবেন কমরুদ্দিন শহুদ। বৈঠকে আরও একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ঃ 'সভা শুরু হওয়া মাত্র শামসুল হক সাহেবকে বক্তৃতা করতে দেয়া হবে এবং তার পরে বক্তৃতা করতে দেয়া হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহবায়ক আবদুল মতিনকে। এরপর আমি সভাপতি হিসেবে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে বক্তব্য রাখব এবং ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত জানিয়ে সভার কাজ শেষ করব।সে রাতের বৈঠকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। তা হলো আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দেবেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র হাবিবুর রহমান(শেলী) ছাড়া পারতপক্ষে আর কেউ গ্রেফতার বরণ করবেন না। আন্দোলনের স্বার্থের খাতিরে তাঁদেরকে বাইরে থাকার চেষ্টা করতে হবে। কেননা, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই সংগ্রামী ছাত্রনেতাদের অংশটির আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে গ্রেফতার এড়িয়ে যাওয়া প্রয়োজন। হাবিবুর রহমান শেলীর বেলায় সিদ্ধান্তটি হল অন্যরকম। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সত্যাগ্রহী দলটি বের হবে তাদের প্রথম গ্রুপের বা ব্যাচের নেতৃত্ব দেবেন হাবিবুর রহমান (শেলী) ; কারণ শেলী ছিলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রদের একজন। তাঁর জীবনের যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে সে উজ্জবল ভবিষ্যতকে উপেক্ষা করে তিনি গ্রেফতার বরণ করবেন। এটা হবে বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের কাছে একটা দৃষ্টান্ত। আমরা যে ধরনের মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছিলাম তিনিও সেই

মধ্যবিত্ত পরিবারেরই একজন। মধ্যবিত্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের ভাষায় তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্মুখে। কিন্তু সেদিন বাংলা ভাষা আন্দোলনের স্বার্থে তিনি আমাদের এ সিদ্ধান্ত জেনে শুনে মেনে নিয়েছিলেন। এর ফলশ্রুতিতে তাঁকে বহু ঝড় ঝাপটা পোহাতে হয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের জন্য তিনি গ্রেফতার হয়ে জেলে গেলেন। জেল থেকে বের হয়ে আসার পর চাকুরীর জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দরখাস্ত করলেন কিন্তু তাঁকে সে চাকুরী দেয়া হলো না। তার প্রতিবাদে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে তিন দিন পান সিগারেটের দোকান সাজিয়ে দোকানদারী করেছিলেন। বাংলা ভাষা আন্দোলনে সেই ২১শে ফেব্রুয়ারীতে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন, স্বাধীনতা উত্তরকালে টেলিভিশনে দুটো সাক্ষাৎকারে এ কথাটি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশেই নাকি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হয়েছিল এবং এটিও বলা হয়েছিলো যে, ২০শে ফেব্রুয়ারীর রাতে বঙ্গবন্ধু নাকি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কোনও এক জানালা দিয়ে এ নির্দেশ দেন। কথাটি আদৌ সত্য নয়। কারণ ১৮ ফেব্রুয়ারী তারিখেই অনশনরত বন্দী শেখ মুজিবুর রহমানকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বিকেল ৩টার দিকে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। তখন জনাব শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলে। সুতরাং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালের কোনও বাথরুমের গবাক্ষ পথে শেখ মুজিবুর রহমান ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার নির্দেশ দিলেন— এটি একটি বানোয়াট গল্প। আমার মনে হয় এ ধরনের গল্প বাজারে ছেড়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মান বৃদ্ধি করা যায় না। ১৪৪ ধারা যেদিন ভাঙ্গা হয় তার আগে থেকে তিনি জেলে ছিলেন। ২১শে ফেব্রুয়ারীর আন্দোলনের সাথে সাক্ষাৎভাবে তিনি জড়িত না থাকলেও তাঁর সংগ্রামী ভাবমূর্তি বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় না। কেননা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা দেখেছি গণতান্ত্রিক যুবলীগ-এর সৃষ্টির সময়। তাঁকে আমরা দেখেছি ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে অন্যতম নেতা হিসেবে। ১৯৪৯ সালে নিম্ন কর্মচারীদের ধর্মঘটের সময় তাঁকে নেতৃত্ব দিতে আমরা দেখেছি। ১৯৪৯ সালের ভূখা মিছিলে তিনি পুরোভাগে ছিলেন। পরবর্তীকালেও তাঁকে দেখেছি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে মুখর। তাঁকে দেখেছি, ১৯৬৬ সালে ৬-দফা আন্দোলনে কারাবরণ করছেন, তাঁর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হয়েছিল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি যদিও কারারুদ্ধ ছিলেন তবুও তাঁর প্রস্তুতিপর্বকালে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং তাঁরই ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ স্বাধীনতা সংগ্রামের ছাত্র,শ্রমিক, জনতার মনে প্রেরণা জুগিয়েছিল। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে তিনি জড়িত না থাকলেও সেদিন তিনি রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে অনশনরত ছিলেন। সুতরাং ২১শে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে তাঁকে মিথ্যামিথ্যি জড়িয়ে গবাক্ষ পথে তাঁকে টেনে এনে ইতিহাসকে বিকৃত করলে আমি মনে করি তাঁর প্রতি অসম্মানই দেখানো হবে।

যাক সে কথা, ২০শে রাতের বৈঠক শেষ হল। সব বন্ধুরা চলে যাচ্ছেন। সুলতান সাহেব ও এম আর আখতার মুকুল সাহেবকে বলা হলো তাঁরা যেন সকাল বেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন। সবাই চলে যাবার পর জনাব আবদুল মোমিন আমাকে বললেন, 'আগামীকাল সকালে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া চলবে না।' আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন ?' তিনি বললেন, 'আপনাকে শেষ রাতেই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতে ঢুকতে হবে।' যুক্তি হিসেবে বললেন, 'ভোরবেলায় হয়তো আপনি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঢুকতে নাও পারেন,

গ্রেফতার হতে পারেন, সুতরাং শেষ রাতেই যেভাবে হোক বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঢুকবেন।'

স্বল্পভাষী মোমিন সাহেবের যুক্তি মেনে নিলাম। রাত সাড়ে তিনটার সময় বিশ্ববিদ্যালয় জিমনাসিয়াম গ্রাউণ্ডের মধ্য দিয়ে মেডিক্যাল কলেজের ভেতরে ঢুকি। তখন মেডিক্যাল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় এ দু'টোর মাঝখানের সীমারেখা ছিল মধুর রেস্তোরাঁর পাশে একটি ছোট্ট পাঁচিল। সে পাঁচিল টপকে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকি এবং রাতের শেষ সময়টুকু বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে কাটিয়ে দেই।

ভোর হলো—সূর্য উঠলো। এ সময় বার বার একটি কথাই মনে পড়ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আমি একা, নিঃসঙ্গ। এ দিনের ভোরের বাতাস জাতির জন্যে কী বয়ে নিয়ে আসছে তা জানিনে। আগের রাতের কথাগুলো মনে পড়ছিল, মনে পড়ছিল বন্ধুদের উজ্জ্বল মুখগুলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রথম যিনি বিশ্ববিদ্যালয় গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকলেন, তিনি হলেন মোহাম্মদ সুলতান। তাঁর সংগে এস এ বারী এ টি এবং আরও দু'জন। তাঁদের নাম মনে পড়ছে না। আমরা দু'জনে (সুলতান এবং আমি) টুকরো কাগজ, সিগারেটের প্যাকেট ছিঁড়ে কিছু চিঠি লেখা শুরু করলাম। কিছু আমার স্বাক্ষরে কিছু সুলতান সাহেবের দস্তখতে। বিভিন্ন স্কুলে এবং বিভিন্ন কলেজে খুব সংক্ষিপ্তভাবে এ চিঠিগুলো লিখে পাঠাই। চিঠি ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মোহাম্মদ সুলতান পগোজ হাইস্কুলের ছেলেদের উদ্দেশ্যে লিখলেন। কথাগুলি এ ধরনের ছিল, 'ছোট ভাইয়েরা, সরকার ১৪৪ ধারা জারী করেছে। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তোমরা দু'জন দু'জন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে এসো।' এমনি ধরনের চিঠি পাঠানো হলো ঢাকা কলেজে, জগন্নাথ কলেজে। মেডিক্যাল কলেজের সংগে সরাসরি যোগাযোগ করলেন আমাদের আর এক বন্ধু। নাম মঞ্জুর— ডাক্তার মঞ্জুর। বাড়ী নওগাঁ। এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৈনিক ছিলেন তিনি। ডাক্তার মঞ্জুরের মাধ্যমে মেডিক্যাল কলেজের সংগে যোগাযোগ করা হলো। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও যোগাযোগ করা হলো। চিঠিগুলো বিভিন্ন ছাত্র সাইকেলে করে নিয়ে যায়। এ সময়ের একটি ছোট মেয়ের কথা মনে পড়ে। সপ্তম কি অষ্টম শ্রেণীতে পড়তো। নাম তার জাহানারা লাইজু (বর্তমানে বাংলাদেশ বিমানে উচ্চ পদে কর্মরত আছেন)। জাহানারা লাইজু সাইকেল চালাতে জানতো। লাইজু এবং আমার ছোট ভাই নিযাম এরা দু'জনে চিঠি বহন করে নিয়ে যায়। এছাড়া আরও অনেকে ছিলেন চিঠি বহনের এবং যোগাযোগের দায়িত্বে। সকাল ৮টার মধ্যে দেখি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা 'কর্ডন' করা হয়েছে। মোমেন সাহেবের সতর্ক বাণী মনে পড়লো, 'সকালে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা কর্ডন হয়ে যেতে পারে, সুতরাং পুলিশ কর্ডনের পূর্বেই আপনার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পৌঁছানো দরকার।

৮টার কিছু পর থেকেই বিভিন্ন হল থেকে, বিভিন্ন স্কুল, কলেজ থেকে দু'জন দু'জন করে ছাত্রবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় জমায়েত শুরু করেন। ৯-৩০টার মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র হাজির হলেন। এ সময় জনাব শামসুল হকও এসে উপস্থিত হন। জনাব শামসুল হকের গায়ে ছিলো একটি কালো শেরওয়ানী এবং মাথায় জিন্নাহ্ ক্যাপ। তিনি এসে মধুর রেস্তোরাঁয় বসলেন এবং সেখানে উপস্থিত সকল ছাত্রদের এ কথাটি বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, '১৪৪ ধারা ভাঙ্গা ঠিক হবে না' 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ' যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা মেনে চলা উচিত। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনই আমাদের করা উচিত।' কিন্তু তাঁর এ বক্তব্য শোনার মত মানসিক অবস্থা তখন ছাত্রদের ছিল না। ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে জনাব শামসুল হককে চতুর্দিক থেকে নানা প্রশ্ন করছিল। তিনি যথাসাধ্য ছাত্রদের বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। এমনি সময়ে একটি

ছোট ঘটনা ঘটলো। জনাব হাসান হাফিজুর রহমান সাহেব এ সময়ে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে, তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে জনাব শামসুল হককে লক্ষ্য করে '**ট্রেইটর**' বলে চিৎকার করে উঠলেন। কথাটি বলার সংগে সংগে তিনি শামসুল হক সাহেবের মাথা থেকে জিন্নাহ্ ক্যাপটি ছিনিয়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এবং চিৎকার করে পুনরায় বলতে থাকেন, '**ইয়্যু হ্যাভ নো রাইট টু স্পিক। গেট আউট।**'

এ সময়ে আরও একটি মুখ মনে পড়ে। আমানুল্লাহ খান নামে একজন দীর্ঘদেহী উন্নতনাসা তিনি বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে বক্তৃতা শুরু করে দেন। সমস্ত পরিবেশ ছিল উত্তেজিত এবং বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। এরই মধ্যে জনাব অলি আহাদ এলেন এবং আমাকে একান্তে ডেকে বললেন যে, তিনি যেহেতু সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের সদস্য এবং যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নন সেহেতু তিনি কোনও বক্তব্য রাখবেন না, তবে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। আমি তখন তাকে ফজলুল হক মুসলিম হলের পুকুরের পূর্ব ধারের সিঁড়িতে আমাদের নেয়া সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলাম।

এরপর একটি ছোট্ট চেয়ার নিয়ে আমতলায় রাখা হলো। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বেলতলাতে দাঁড়িয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারীতে যে-ধর্মঘট এবং মিছিলের আহ্বান জানানো হয়েছিল, ২১শে ফেব্রুয়ারীতে বেলা ১১/১১-৩০তে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলাতে সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সভা আরম্ভ হলো। সভাপতি হিসেবে আমার নাম প্রস্তাব করলেন এম আর আখতার মুকুল, সমর্থন করলেন জনাব কমরুদ্দিন শহুদ। সভাপতি হিসেবে আমি প্রথমে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের পক্ষ থেকে জনাব শামসুল হককে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাই। কিছু ছাত্র, এতে বাধা দিলেও শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর বক্তব্য রাখেন। জনাব হক বাগ্মী ছিলেন। চমৎকার বলতে পারতেন। ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার পক্ষে তিনি যুক্তি উপস্থাপন করে ছাত্রদের বোঝাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু জনাব হকের কোনও যুক্তিই আমতলায় সমবেত ছাত্ররা মানতে রাজী ছিল না। দু'একজন অবশ্য তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সম্মিলিত ছাত্রদের উত্তপ্ত বিক্ষোভের জন্য তা সম্ভব হয়নি। এরপর জনাব আবদুল মতিনকে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানানো হয়। আবদুল মতিন শান্তভাবে যুক্তি দিয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে বক্তব্য রাখলেন। সবশেষে সভাপতি হিসেবে আমি আমার বক্তব্য রাখি। আমার মনে পড়ে আমি বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। আমার সেদিনের বক্তব্যের সব কথা মনে পড়ে না। যুক্তির চাইতে আবেগই ছিল বেশী, তবে মোটামুটিভাবে শেষাংশ বোধহয় এরকম ছিল, নূরুল আমিন সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে পুলিশ মোতায়েন করেছে। ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা হলে নাকি গুলি করা হবে—ছাত্রদের গুলি করে হত্যা করা হবে। আমরা নূরুল আমিন সরকারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি। ১৪৪ ধারা আমরা ভাঙবো। আমরা দেখতে চাই জনাব নূরুল আমিন সরকারের বারুদাগারে কত বুলেট জমা আছে।' আমার বক্তৃতা শেষ করার সংগে সংগে চতুর্দিক থেকে ধ্বনিত হলো "১৪৪ ধারা মানি না—মানি না।" ঠিক এমনি সময় আবদুস সামাদ চিৎকার করে বললেন, আমরা সত্যাগ্রহ করবো, এবং কিভাবে করবো—কয়জন করে ?' তিনি একটি প্রস্তাবও আনলেন দশজন দশজন করে সত্যাগ্রহ করা হবে—১৪৪ ধারা ভাঙ্গা হবে। প্রস্তাবটি গৃহীত হলো। সত্যাগ্রহীরা শান্তিপূর্ণভাবে ভাষার দাবীতে শ্লোগান দিয়ে পরিষদ ভবনের দিকে যাবে।

মোহাম্মদ সুলতানকে ডেকে বলা হলো, যেসব সত্যাগ্রহীর দল বাইরে যাবেন তাঁদের প্রত্যেকের নাম-ঠিকানা লিখে রাখার জন্য, যাতে পরে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে সহজেই

নাম-ঠিকানা পাওয়া যায়। মোঃ সুলতান বিশ্ববিদ্যালয় গেটে চলে গেলেন। বিশ্ববিদ্যালয় গেট তখন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সত্যাগ্রহীরা এক একটি দলে বের হচ্ছে, আর জনাব সুলতান নাম লিখে চলেছেন, তাঁকে সাহায্য করছেন জনাব আজহার (এক সময়ের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষাসচিব)। হাসান হাফিজুর রহমানও গেটে দাঁড়িয়ে সত্যাগ্রহীদের নামগুলো ঠিক করে দিচ্ছিলেন। প্রথম দলের নেতৃত্ব পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনাব হাবিবুর রহমান শেলী গ্রহণ করেন। হাবিবুর রহমান শেলীর নেতৃত্বেই প্রথম সত্যাগ্রহীর দলটি বেরিয়ে পড়ে। সংগে সংগে দ্বিতীয় দলের নেতৃত্ব দিয়ে জনাব ইব্রাহীম তাহা ও আবদুস সামাদ বাইরে বেরুলেন। তৃতীয় দল নিয়ে বেরুলেন আনোয়ারুল হক খান এবং জনাব আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। তিনটি সত্যাগ্রহী দলকই পুলিশ গ্রেফতার করে এবং ট্রাকে তুলে নেয়। এ সময় পুলিশের তরফ থেকে গেটে একটি হামলা ও লাঠি চার্জ হয়।

লাঠি চার্জের প্রেক্ষিতে আর একটি সিদ্ধান্ত আমরা নিলাম ঃ চতুর্থ যে দলটি যাবে তা যাবে সাফিয়ার নেতৃত্বে। এই দলে বেশ কয়েকজন ছাত্রী ছিলেন। এদের সকলের নাম মনে পড়ছে না। ডঃ সাফিয়া, সুফিয়া ইব্রাহীম, রওশন আরা বাচ্চু, শামসুন নাহার আরও কয়েকজন ছিলেন। পুলিশ এ সময় লাঠি চার্জ করে এবং কাঁদনে গ্যাস ছোঁড়ে। রওশন আরা বাচ্চু, ডঃ সাফিয়া প্রমুখ বেরিয়ে যাচ্ছিল। তখন পুলিশ তাদের ওপর লাঠি চার্জ করে। আমি যতদূর জানি রওশন আরা বাচ্চু এবং সুফিয়া ইব্রাহীম পুলিশী হামলায় সামান্য আহত হন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, মেয়েদের মধ্যে ডাঃ সাফিয়া এবং রওশন আরা বাচ্চু রাজনৈতিক দিক থেকে অধিকতর সচেতন ছিলেন।

মেয়েদের সত্যাগ্রহীর দলটি বেরিয়ে যাওয়ার পর পরই এস এ বারী এ টি, শামসুল হক, আনোয়ার আজিম (পরবর্তীকালে ছাত্র ইউনিয়ন সম্পাদক) সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, সৈয়দ ফজলে আলীর নেতৃত্বে আর দু'টি সত্যাগ্রহী দল বের হয়ে যায়। এবং এর পরই দলে দলে ছাত্ররা পুলিশী হামলা এবং বাধা উপেক্ষা করে বেরিয়ে আসতে থাকে। আমার যতদূর মনে পড়ে মোহাম্মদ সুলতান এক সময় বললেন, 'সত্যাগ্রহীদের নাম লেখার সময় পাওয়া যাচ্ছে না।' এ সময়ে কাঁদানে গ্যাসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ অন্ধকার হয়ে পড়ে। কাঁদানে গ্যাসের একটি শেল এসে সরাসরি আমার বুকে লাগে এবং আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। পরে জেনেছি জুলমত আলী খান এবং এম আর আখতারসহ কয়েকজন বন্ধু আমাকে ধরাধরি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের দোতলায় নিয়ে যায়। আমি অজ্ঞান হওয়ার পূর্বে দেখেছি বিশৃঙ্খলাজনিত অবস্থা। পুলিশের লাঠি চার্জের ফলে ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল ছুঁড়ছে। ছাত্ররা মেইন গেট দিয়ে বেরুতে না পেরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বদিকে মধুর রেস্তোরাঁর সংগে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা যে ছোট প্রাচীরটি ছিল—তা টপকিয়ে মেডিক্যাল কলেজে যেতে থাকে এবং মেডিক্যাল কলেজ থেকে বেরিয়ে পরিষদের দিকে মিছিল নিয়ে এগোবার চেষ্টা করে। পুলিশের উপর ছাত্রদের ইট-পাটকেল ছোঁড়া নিয়ে যে কি রকম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সেদিনের একটি ছোট ঘটনার উল্লেখেই তা বোঝা যাবে। জনাব হাসান হাফিজুর রহমান এবং আজহারকে পাঠানো হয়েছিল যাতে ইট-পাটকেল ছোঁড়া বন্ধ হয় তার জন্য চেষ্টা করতে। হাসান হাফিজুর রহমান এবং আজহার গেলেন। কিন্তু পরিস্থিতি এমন ছিল যে, ইট ছুঁড়তে বারণ না করে তারা নিজেরাই ইটের বড় বড় টুকরো নিয়ে পুলিশের প্রতি ছুঁড়তে থাকেন।

একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন। না বললে অন্যায় করা হবে। একথা সত্য, জনাব শামসুল হক সভায় ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। কিন্তু যখনই ১৪৪ ধারা

ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো তখনই শামসুল হক আমাকে বললেন, 'এ সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিলাম। এবং আমি এ সংগ্রামের সংগে আছি।' সুতরাং সেদিন যে কোনও কারণেই হোক ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার বিরুদ্ধে যাঁরা ছিলেন, আমাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর তাঁরা প্রায় সবাই আমাদের সিদ্ধান্তকেই মেনে নেন। এবং আন্দোলনে অংশ নেন। এঁদের অনেকেই ঐদিন গ্রেফতার হন। জনাব শামসুল হকও পরবর্তীকালে গ্রেফতার হয়ে দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন।

মেডিক্যাল কলেজের গেট দিয়ে ছাত্ররা বেরোবার চেষ্টা করলে সেখানে পুলিশের বাধা এলো। লাঠিচার্জ হলো। পুলিশের সংগে ছাত্রদের প্রায় খন্ড যুদ্ধ শুরু হলো। এ সময়ে পুলিশ গুলি ছোঁড়ে এবং পুলিশের গুলিতে বরকত রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে যায়। বরকত ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এম এ শেষবর্ষের ছাত্র। দীর্ঘদেহী, বোধহয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘদেহী। শ্যামলা ছিপছিপে একহারা গড়নের। মুখটা শিশুর মতো সরল। আমাদের সংগে বিশেষ করে হাসান হাফিজুর রহমান, আবু নাসের ওয়াহেদ প্রমুখের সংগে বেশ হৃদ্যতা ছিল। রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে খুব সক্রিয় ছিলেন বলে জানি না। তবে ঐদিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন এবং শামসুল হক যখন রেস্তোরাঁয় বসে তাঁর বক্তব্য পেশ করছিলেন তখন বরকতও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। পরে বন্ধু ডঃ রফিকুল ইসলামের কাছ থেকে বরকতের গুলি খাওয়ার ঘটনা শুনেছিলাম। পুলিশ সরাসরি গুলি চালিয়েছিল এবং বরকত গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। বরকতকে ছেলেরা ধরাধরি করে মেডিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে যায়। ডঃ রফিকুল ইসলাম (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক) বরকত যে বাসায় থাকতেন সেখানে খবর দেন।

পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে গোটা পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে দাঁড়ালো। সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ ব্যারাক প্রাঙ্গণ ছাত্রে থৈ থৈ করছে। ভয়, শঙ্কাহীন ছাত্ররা ঘন ঘন শ্লোগান দিচ্ছিলো। মনে পড়ছে পার্টির নেতৃস্থানীয় একজন বললেন, "আপনি ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার নির্দেশ দিয়ে চূড়ান্ত অন্যায় করেছেন এবং আগামীকাল যদি এ আন্দোলন ব্যর্থ হয় তাহলে আপনাকে দায়ী করা হবে।" সেদিন সে কথার কোনও উত্তর দিতে পারিনি। মেডিক্যাল কলেজ ব্যারাক থেকে সমবেত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন জনাব শহীদুল্লা কায়সার। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল এবং ফজলুল হক মুসলিম হলের ছাত্ররা বাইরে থেকে মাইক জোগাড় করে এনে বক্তৃতা শুরু করেছিলো। সমস্ত রমনা বিষণ্ণ এবং উত্তপ্ত। স্বল্প সময়ের মধ্যেই হাসান হাফিজুর রহমান এবং রফিকুল ইসলাম নিজেদের উদ্যোগে একটি ইশতেহার ছাপিয়ে আনেন। ইশতেহারে ভুলবশতঃ শিক্ষামন্ত্রী জনাব মফিজউদ্দিনের প্রতি অহেতুক দোষারোপ করা হয়েছিলো।

২১শে'র দিন গুলি চলার পর মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ পরিষদ মূলতবী রাখবার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁর আবেদন উপেক্ষা করায় তিনি সংগে সংগে পরিষদ-কক্ষ ত্যাগ করে চলে আসেন। এ সময় আরও কয়েকজন পরিষদ-সদস্য সরেজমিনে অবস্থা দেখার জন্য পরিষদ-কক্ষ ত্যাগ করেন এবং ছাত্রদের সংগে সংগ্রামে তাদের একাত্মতা ঘোষণা করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন 'আজাদে'র সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন, শ্রী সতীন সেন প্রমুখ। জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে সংসদ-সদস্য পদে ইস্তফা দেন।

২১শে ফেব্রুয়ারীর রাতে আবার আমরা সবাই বসলাম। আগেকার সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষাকর্ম-পরিষদের সিদ্ধান্ত ছিল ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে স্বাভাবিকভাবে উক্ত পরিষদকে বিলুপ্ত বলে ধরে নেয়া হবে। সুতরাং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার ফলে রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের কোনও অস্তিত্ব তখন আর ছিল না। এমনি অবস্থায় সন্ধ্যায় মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের

ব্যারাকে আবার সবাই জড়ো হলেন এবং সে রাতেই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদ নতুন করে গঠিত হলো। সে পরিষদের নতুন আহবায়ক হলেন জনাব অলি আহাদ।

২২শে ফেব্রুয়ারী শহীদদের গায়েবী জানাজাতে মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশও উপস্থিত ছিলেন। গায়েবী জানাজা শেষে একটি বাঁশের মাথায় শহীদের রক্তাক্ত জামা বেঁধে নিয়ে শুরু হলো মিছিল। মিছিল মেডিক্যাল কলেজ থেকে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে কার্জন হল এবং হাইকোর্টের মোড় ঘুরে এগোবার সময় হঠাৎ করে পুলিশ মিছিলের মাঝখানে লাঠিচার্জ করে। লাঠিচার্জে বহুলোক গুরুতরভাবে আহত হলো। ছত্রভঙ্গ মিছিল আবার একত্রিত হলো; এগিয়ে চললো, গুলি চললো মানসী সিনেমা হলের কাছে। মিছিল তবু এগিয়ে যায়। মর্নিং নিউজ অফিসে যখন জনতা হামলা চালালো তখনও পুলিশ আবার গুলি চালায়। বিক্ষুব্ধ জনতা মর্নিং নিউজ অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়। মিছিল আবার এগোতে থাকে। চকবাজারে আবার গুলি, আবার হামলা। সেদিন সারাদিন পুলিশের সংগে নিরস্ত্র মানুষের হয়েছিলো খণ্ড খণ্ড অসম সংঘর্ষ।

২২শে ফেব্রুয়ারী রাত। মেডিক্যাল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররা মিলে মেডিক্যাল কলেজের ব্যারাকের সামনে শহীদ মিনার গড়ে তুললেন। হাতে হাতে বয়ে নিয়ে এলেন ইট। নিজেরাই অপটু হাতে কর্ণি ধরলেন। রাতের অন্ধকারে নির্মিত হলো প্রথম শহীদ মিনার। ভোর হতে না হতেই মানুষ এসে শহীদ মিনারে ফুল দিতে লাগলো। মিছিলের পর মিছিল এসে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাতে লাগলো। মেডিক্যাল কলেজ ব্যারাক প্রাঙ্গণে শহীদ মিনারের সামনে অশ্রুসজল জনতার ভীড়।

২৪শে ফেব্রুয়ারীতে মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেলে আবার সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদ সাময়িকভাবে ধর্মঘট তুলে নিলেন। এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী পূরণের জন্য সরকারকে ৫ই মার্চ পর্যন্ত সময় দিলেন। ঐ ৫ই মার্চের মধ্যে দাবী পূরণ না হলে আবার হরতাল চলবে বলে চরমপত্র দেয়া হলো। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে প্রকৃতপক্ষে ২১শে বিকাল থেকে ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত, ঢাকা শহরের শাসনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল এবং ফজলুল হক মুসলিম হল। সেদিন ঢাকার জনসাধারণ এ তিন জায়গা থেকে যে নির্দেশ পেতেন তা পালন করতেন। এ চারটি দিন তারা এ দেশের সরকারকে উপেক্ষা করেছিলেন এবং সরকারের উপর তাঁদের সম্পূর্ণ অনাস্থা জ্ঞাপন করেছিলেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারী বিকেলে পূর্ববঙ্গ সরকারের পুলিশ বাহিনী এবং সামরিক বাহিনী আবার হামলা চালালো। সলিমুল্লাহ হল ঘেরাও করলো পুলিশ। দলে দলে ছাত্রদেরকে গ্রেফতার করা হলো। ফজলুল হক মুসলিম হল ঘেরাও করে সেখান থেকে ছাত্রদের গ্রেফতার করলো। ২২শে ফেব্রুয়ারীর রাতে যে শহীদ মিনারটি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সামনে তৈরী করা হয়েছিল, সেটিকে পুলিশ বাহিনী এবং সামরিক বাহিনী মাটির সাথে মিশিয়ে দিলো। শহীদ মিনারের উপরে তারা যেন হিংস্র পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়লো। গুঁড়িয়ে দিলো ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ মিনার।

২৬শে ফেব্রুয়ারীর বিকেলের হামলার পরে রাষ্ট্রভাষা আন্দালনের নেতৃবৃন্দ আবার প্রস্তুতির জন্য আত্মগোপন করলেন। এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে পুনরায় উজ্জীবিত করার জন্য তাঁরা আত্মগোপন অবস্থায় কমলাপুরের নিকটে এক বৈঠকে মিলিত হন। সেখান থেকেই জনাব অলি আহাদ, জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা, জনাব আব্দুল মতিন প্রমুখ নেতা গ্রেফতার হয়ে যান। কাজী

গোলাম মাহবুব সাহেবও সে সভায় ছিলেন কিন্তু তিনি কোনও প্রকারে সটকে পড়ে গ্রেফতার এড়াতে সক্ষম হন।

যাই হোক, ৫ই মার্চে যে হরতালের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, সে ঘোষণা মোতাবেক ৫ই মার্চের হরতালকে পরিপূর্ণভাবে সাফল্যমন্ডিত করা যায়নি। তবে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ—এ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হরতাল পালিত হয়। এ ছাড়া স্কুল কলেজেও আংশিক হরতাল পালিত হয়েছিলো। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন ২১শে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনকে আমরা কোনও সংগঠিত রূপ দিতে পারিনি। কেননা, তখন কোনও রাজনৈতিক দলেরই সংগঠন সুদৃঢ়ভাবেগ্রামভিত্তিক ছিল না। এ ছাড়া যে যুবলীগ আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল তারও শক্তি ছিল সীমিত। যুবলীগ সংগঠনও সে সময়ে খুব বিস্তার লাভ করেনি। পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগেরও একই অবস্থা। ফলে, বিভিন্ন জেলায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সংগঠিত রূপ দেয়া সম্ভব ছিলনা। তবু দেখা গেছে, এ আন্দোলনের সঙ্গে সেদিনকার পূর্ববঙ্গের সকল মানুষ একাত্মতা ঘোষণা করেন। কোনও প্রচার নেই, কোনও সংগঠনের ডাক নেই, তবু সুদূর প্রত্যন্ত অঞ্চলের হাট-বাজারে হরতাল হয়ে গেছে, স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে। সারা পূর্ব-বাংলার মানুষ সেদিন ভাষার দাবীতে মুখর হয়ে উঠেছিল। ভাষা আন্দোলনের এই যে ব্যাপকতা, এই যে বিস্তার এবং পূর্ব-বাংলার মানুষের এই যে প্রাণচাঞ্চল্য, এই যে আত্ম-নিবেদন, এটি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই পূর্ব-বাংলার মানুষের সাথে এদেশের গণতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক কর্মীদের একটা প্রাণের যোগ সংস্থাপিত হয়, যা এর পূর্বে আর কখনও হয়নি।

১৯৫২ সালের মার্চ মাসে জনাব শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি পান। কিছু দিন পর অর্থাৎ জনাব অলি আহাদের গ্রেফতারের পরে আবার নতুনভাবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদ গঠিত হয়। এবং সেই কর্ম-পরিষদের আহ্বায়ক নিযুক্ত হন জনাব আতাউর রহমান খান। ১৯৫২ সালের আগষ্ট মাসে কুমিল্লায় একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক আবুল খায়ের এবং অধ্যাপক আসহাবউদ্দীন আহমদ। সম্মেলনে প্রায় সারা পূর্ব-বাংলার দাবীকে পুনরায় উত্থাপন করা হয় এবং ভাষা আন্দোলনের রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী করা হয়। এখানে বলা প্রয়োজন, ভাষা আন্দোলনের জন্য ছাত্র ছাড়াও আরও অনেকেই গ্রেফতার হয়েছিলেন। শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন জনাব মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক অজিত গুহ, অধ্যাপক সুনীল দে, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী প্রমুখ। মুনীর চৌধুরী এবং অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী এঁরা ২২শে ফেব্রুয়ারীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের একটি সভা করেন এবং সেই সভায় পুলিশী নির্যাতন, গুলি বর্ষণ ইত্যাদির তীব্র নিন্দা করেন এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানান। ফলে, তাঁদের দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। এ ছাড়া আর যাঁরা গ্রেফতার হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, জনাব আবুল হাশেম, জনাব শামসুল হক, জনাব আব্দুর রশীদ তর্কবাগিশ, নারায়নগঞ্জের জনাব ওসমান আলী, জনাব খালেক নওয়াজ খান, বরিশালের সত্যেন সেন, গোবিন্দ বাবু, বাবু মনোরঞ্জন ধর প্রমুখ। এঁরা সকলে গ্রেফতার হয়ে দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন।

এরপর উনিশ শ' তিপান্ন সাল।

১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী উদযাপন করার জন্য সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদ সিদ্ধান্ত নেন। তখন ঐ কর্ম-পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন জনাব আতাউর রহমান খান।

বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির তরফ থেকে ১৯শে ও ২০শে ফেব্রুয়ারী রোজা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৮ই ফেব্রুয়ারীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির যারা সদস্য ছিলেন, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা ছাত্রদের নেতৃত্ব দিতেন, তাঁদের সাথে আলোচনা করার জন্য ইডেন বিল্ডিং-এ (সেক্রেটারিয়েটে) ডেকে পাঠানো হলো। তখন চীফ সেক্রেটারী ছিলেন জনাব মোহাম্মদ ইসহাক। চীফ সেক্রেটারী খুব অমায়িক লোক। পুলিশ কমিশনার ছিলেন জনাব দোহা আর জি ও সি ছিলেন মেজর জেনারেল আদম। এ বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটির তরফ থেকে পাঠানো হলো জনাব আব্দুস সামাদ, জনাব মোহাম্মদ সুলতান, জনাব আক্তারউদ্দীন, জনাব শামসুল হক, জনাব জিল্লুর রহমান, জনাব ইব্রাহীম তাহা এবং আমাকে। আমাদের ধারণা ছিল, হয়তো বা আমাদের গ্রেফতার করা হবে। তাই আমরা বৈঠকে যাওয়ার আগে আর একটি কমিটি মনোয়ন করে যাই। এ কমিটিতে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন খোন্দকার গোলাম মোস্তফা, ইসতিয়াক আহমদ, আবু জাফর ওবায়েদুল্লাহ খান এবং আনোয়ারুল আজিম। কথা ছিল আমরা গ্রেফতার হয়ে গেলে ২১শে'র কর্মসূচীকে তাঁরা সাফল্যমন্ডিত করবেন। বৈঠকে আলোচনার সময় জনাব দোহা (আই জি) এক পর্যায়ে আমাদের সঙ্গে রূঢ় ভাষা ব্যবহার করেন। অবশ্য তার চেয়েও চড়া গলায় কথা বলছিলেন মেজর জেনারেল আদম। আমরাও পাল্টা জবাব দিতে থাকি। এক পর্যায়ে জনাব ইব্রাহীম তাহা জেনারেল আদমকে বলে বসেন যে, "আপনি বলতে চান, কেন আমরা আন্দোলন করি ? এর কারণ আপনি জানতে চান ? আপনি জেনে সুখী হবেন যে আপনার কুকুরটি যতটুকু গোস্ত একদিনে খায় আমরা সপ্তাহেও সেই পরিমাণ গোস্ত খেতে পাই না।" এ কথায় জনাব আদমও খুব চটে যান। এমনি সময়ে চীফ সেক্রেটারী জনাব ইসহাক আলোচনায় হস্তক্ষেপ করেন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় বৈঠকের শান্ত পরিবেশ ফিরে আসে। ইসহাক সাহেব জানান, ১৪৪ ধারা জারী করার ইচ্ছা সরকারের নেই মিছিলে বাধা দিতেও সরকার চান না। তবে ছাত্ররা যেন মিছিল করতে গিয়ে কোনও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে বা সরকারী সম্পত্তির কোনও ক্ষতিসাধন না করে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও পাল্টা প্রস্তাব দিলাম যে, 'যদি মিছিলের সামনে এবং পিছনে একশ' গজের মধ্যে কোনও পুলিশ না থাকে তবে শোভাযাত্রা শান্তিপূর্ণ হবে বলেই আমরা আশা করি। কিন্তু পুলিশ "যদি আমাদের শোভাযাত্রায় বাধা দেয় কিংবা শোভাযাত্রাকে ঘিরে চলে তবে যে কোনও মুহূর্তে গোলমাল হতে পারে এবং তার জন্যে আমরা দায়ী হবো না। সুতরাং মিছিলের একশ' গজের মধ্যে পুলিশ থাকা চলবে না।" এই প্রস্তাবে মিঃ দোহা আপত্তি করেছিলেন—কিন্তু জনাব ইসহাক প্রস্তাবটি মেনে নেন। তিনি আমাদের জানালেন শোভাযাত্রার একশ গজের মধ্যে সামনে কিংবা পেছনে কোনও পুলিশ থাকবেনা। এর পর জনাব ইব্রাহীম তাহা তাঁর বুকে শহীদদের স্মরণে যে কালো ব্যাজটি ছিল তা জনাব ইসহাকের বুকে পরিয়ে দেন। জনাব ইসহাক হাসতে হাসতে ব্যাজটি পরে নিলেন। আমরা ফিরে এসে বক্সীবাজার রোডে জনাব সুলতানের বই-এর দোকান 'পুথিপত্রে' অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হই।

২০শে ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত ২টায় ফজলুল হক মুসলিম হলে ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকদের বৈঠক। রেল ধর্মঘট করাতে হবে। ঢাকা রেলওয়ে ওয়ার্কশপে পিকেটিং করাতে হবে। সুতরাং রাত সাড়ে তিনটায় তাজউদ্দীন এবং আমি দু'দল ছাত্রকর্মী নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। পিকেটিং এ সাড়া দিলেন রেল শ্রমিকগণ। রেলের চাকা বন্ধ। ১৯৫৩-র ২১শে ফেব্রুয়ারীতে ঢাকায় কোনও রেলগাড়ীর চাকা ঘোরেনি।

২১শে ফেব্রুয়ারী মিছিল শুরু হলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে। ভোর বেলাতেই জনাব আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ নেতৃবর্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে জমায়েত হয়েছিলেন। মিছিল শুরু হলো। মিছিলের সামনে জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, ইমাদুল্লাহ। কালো পতাকাটি কখনো আমি কখনো বা আব্দুলওদুদ পাটোয়ারী বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। সকল স্তরের জনগণ ছিল আমাদের সঙ্গে। সারা ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে মিছিল এসে জমায়েত হলো আরমানীটোলা ময়দানে। আরমানীটোলা ময়দানের সভায় সেদিন সভাপতিত্ব করেন জনাব আতাউর রহমান খান। প্রতিটি ছাত্রদল থেকে একজন করে এ সভায় বক্তৃতা করেন। যুবলীগ থেকে জনাব ইমাদুল্লাহ এবং আওয়ামী লীগ থেকে জনাব শেখ মুজিবুর রহমান। সভায় ভাষা আন্দোলনের বন্দীসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করা হয়। শহীদদের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে মোনাজাত করা হয়। সভায় শেখ মুজিবুর রহমান-এর অনুরোধে ভাষা আন্দোলনের ওপর লেখা আমার গানটি আমাকে গেয়ে শোনাতে হয়। এখানে বলা প্রয়োজন, ১৯৫৩-৫৪-৫৫ সালে যে গানটি গেয়ে প্রভাত-ফেরী করা হতো সে গানটি লিখেছিলাম আমি। গানটির প্রথম লাইন ছিল 'ভুলবো না ভুলবো না—একুশে ফেব্রুয়ারী ভুলবো না।' সময়ের প্রয়োজনে এ গানটি লিখেছিলাম। গানের সুরটিও তেমন ভালো ছিলনা। একটি গানের সুরের অনুকরণে সুর দেয়া হয়েছিল। শব্দ চয়নও ছিল দুর্বল। এসব কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা পাবার কিছু নেই। পরবর্তীকালে আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী রচিত এবং শহীদ আলতাফ মাহমুদ সুরারোপিত গানটি এ দেশের মানুষ গ্রহণ করে এবং আজ পর্যন্ত সে গানটিই প্রভাতফেরীতে গাওয়া হয়ে থাকে। গানটির আবেদন সার্বজনীন আর তাই তা আজও এদেশের মানুষের হৃদয়-মন্দিরে।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর পর থেকে একটি অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রায় প্রতিটি জেলা থেকে জোর দাবী উত্থাপিত হতে থাকে। এই দাবীর ফলশ্রুতিতেই ছাত্র ইউনিয়নের জন্মলাভ ঘটে। এই সংগঠনের প্রথম সভাপতি হলেন মোহাম্মদ সুলতান এবং সাধারণ সম্পাদক হলেন মোহাম্মদ ইলিয়াস (পরবর্তীকালে তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দেন এবং জাতীয় পরিষদের সদস্য হন)। জনাব ইলিয়াস ৫২-৫৩ সালে ঢাকা কম্যুনিষ্ট পার্টির জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। ছাত্র ইউনিয়নের জন্মের পর এদেশের রাজনৈতিক ধারা একটি নতুন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে। যুবলীগ ছিল একটি অসাম্প্রদায়িক যুব প্রতিষ্ঠান। এর সঙ্গে যুক্ত হলো অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠান 'পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন'।

'ধূমকেতু শিল্পী-সংঘ' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এ সময়ে গঠিত হয়। এই সংগঠনে ছিলেন আলতাফ মাহমুদ, নিযামুল হক, আব্দুল মোমেন, মোসলেহউদ্দীন প্রমুখ। মেয়ে শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন জাহানারা লাইজু, সেতারা, পারুল, এবং তোয়াহা সাহেবের মেয়ে চিনু। আলতাফ মাহমুদের গাওয়া গান 'এক ঝাঁক উজ্জ্বল পায়রার' সঙ্গে জনাব তোয়াহার ছোট্ট মেয়ে চিনু সেদিন নাচতো একটি সাদা পোশাক পরে, সাদা ছোট্ট একটি পায়রার মতোই।

এই শিল্পী সংঘ সেদিন ঢাকা সহ প্রতিটি জেলা শহরে গণসঙ্গীত পরিবেশন করে বেড়িয়েছে। গণসঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্যনাট্যও তারা পরিবেশন করতেন। ধূমকেতু শিল্পী সংঘ সেদিন এ দেশের মানুষের প্রাণের দাবী মেটাতে পেরেছিল। আমরা '৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে দেখেছি বক্তৃতা মানুষকে যতখানি না আকর্ষণ করতে পেরেছিলো তারচেয়ে শিল্পী সংঘের গণসঙ্গীতের আসর মানুষকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল, অভিভূত করেছিল।

১৯৫২ সালের আগষ্ট মাসে একটি নতুন অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের জন্মলাভ ঘটে। গণতন্ত্রী দল। প্রথমে যে কমিটি হয় তার আহ্বায়ক ছিলেন জনাব আতাউর রহমান। পরে ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে গণতন্ত্রী দলের সম্মেলন হয়। সম্মেলনে হাজী দানেশ সাহেবকে সভাপতি এবং জনাব মাহমুদ আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে গণতন্ত্রী দলের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। গণতন্ত্রী দল গঠনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন জনাব মাহমুদ আলী, হাজী মোহাম্মদ দানেশ, জনাব আতাউর রহমান, জনাব মীর্জা গোলাম হাফিজ, জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন (বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি) জনাব খাজা আহমদ প্রমুখ। গণতন্ত্রীদলের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র পরবর্তীকালে আওয়ামী মুসলিম লীগের অসাম্প্রদায়িকীকরণে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

১৯৫৩ সালে আর একটি ঘটনা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কালাকানুনের বিরুদ্ধে ছাত্রদের আন্দোলন। বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি এবং সভাসমিতিকে নিষিদ্ধ করে একটি ঘোষণা দেয়া হয়। এই ঘোষণা প্রত্যাহারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতৃবৃন্দের তরফ থেকে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। আমার মনে পড়ছে ১৪ই এপ্রিল (১৯৫৩) সেদিন ১লা বৈশাখ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডক্টর মযহারুল হকের সঙ্গে আমার দেখা। হাত দিয়ে ইশারা করে তিনি আমাকে ডাকলেন। তাঁর নিকটে গেলে তিনি বললেন, "আমার করার কিছুই ছিল না। আমরা একটা অন্যায় করেছি।" খুব নাটকীয়ভাবে কথাগুলো বলেই তিনি ভেতরে চলে গেলেন।

স্মারকলিপিতে আমরা যারা স্বাক্ষর করেছিলাম তারা প্রত্যেকেই বিকেলের দিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে একটি করে হুকুমনামা বা আদেশ পেলাম। আমাদের প্রত্যেককেই চার বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আমি তখন আইন ক্লাশের ছাত্র। খন্দকার গোলাম মোস্তফা এম এ শেষ পর্বের ছাত্র। জিল্লুর রহমান আইন ক্লাশের ছাত্র। আক্তারউদ্দীন আহমদ এম এ শেষ বছরের ছাত্র। শামসুল হক এম এ শেষ-পর্বের ছাত্র। বিকেলে প্রতিটি হলে সভা হলো। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে ছাত্ররা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলেন। পরদিন সকালেই বিভিন্ন হলের নেতৃবৃন্দ এবং ছাত্ররা মিলে সংগ্রাম-কমিটি গঠন করলেন। সংগ্রাম-কমিটি থেকে ডাক এল ধর্মঘটের। ছাত্ররা ক্লাশ বর্জন করলেন। পরীক্ষা বর্জন করলেন।

তারপর দিন ১৬ই তারিখে সংগ্রাম কমিটির তরফ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসভা ঘোষণা করা হলো এবং ১৭ তারিখে পল্টন ময়দানে জনসভা ঘোষণা করা হলো। পল্টন ময়দানে জনসভার জন্য মাইক ব্যবহারের অনুমতি আমরা চাইলাম। কিন্তু আমাদের সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। ১৬ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিরাট ছাত্র-সভা হয়, সেই ছাত্র-সভায় আমরা প্রস্তাব আনলাম যে, প্রতিটি ছাত্র অন্ততঃ ১০ থেকে ২০ জন লোককে মুখে মুখে ১৭ই এপ্রিল পল্টন ময়দানে এ জনসভার কথা বলে যাবেন। আর এ কথাটুকুও তারা বলবেন, যেহেতু সরকার মাইকে প্রচারের অনুমতি দেননি, সেহেতু মুখে মুখে সভার কথা প্রচার করা হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের এ প্রস্তাবকে কিভাবে গ্রহণ করেছিলো তা পল্টন ময়দানে জনতার সংখ্যা এবং সভার সাফল্য দেখে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। আমরা কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলাম হয়তো ভাল প্রচার করতে পারেনি অথবা এ প্রচারে সাধারণ মানুষ নাও আসতে পারে। কিন্তু এদেশের মানুষ যে ছাত্রদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি সেদিন। ১৯৫২ এর ২১, ২২, ২৩, ২৪শে তারিখে এবং ১৯৫৩ এর ১৭ই এপ্রিলে ছাত্রদের প্রতি জনগণের প্রাণঢালা ভালবাসা আমরা দেখেছি। মাইকে কোনও প্রচার ছিলনা। শুধু ছাত্র-ছাত্রীরা মুখে মুখে বলে গেছে যে

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহিষ্কারের প্রতিবাদে ১৭ই এপ্রিল তারিখে পল্টন ময়দানে একটি জনসভা বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে। ১৭ই এপ্রিলের সে সভায় আমি এবং ইসতিয়াক আহমদ দু'জনে একসাথেই যাই। কথা প্রসঙ্গে ইসতিয়াক বলছিলেন, "গাজী ভাই, দেখবেন মাঠ হয়তো একেবারেই ফাঁকা।" আমি হেসে বললাম যে, ফাঁকা মাঠেও বক্তৃতা করার অভ্যেস আমার আছে। কিন্তু পল্টন ময়দানে গিয়ে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। ৪টার আগেই সেখানে ৩০ হাজারের অধিক শ্রোতা জমা হয়েছে। সভা আরম্ভ করার সময় প্রায় ৫০ হাজারেরও অধিক জনতা। প্রথমে ভয় ছিল হয়তো লোকজন হবেনা। কিন্তু এখন আর এক চিন্তা যে এতো লোকের মাঝে মাইক ছাড়া কিভাবে বক্তব্য পৌছবে। সভার মাঝখানে একটি টেবিল রাখা হলো। সে টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে আমরা সেদিন এ বিরাট জনসভায় আমাদের বক্তব্য পেশ করি।

আমাদের চারপাশের লোক অনেকটা যাত্রার দর্শকের মতো আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং আমরাও চারদিকে ঘুরে ঘুরে আমাদের বক্তব্য পেশ করতে থাকি। সেদিন আমাদের বক্তব্য এ বিশাল জনতা ধৈর্যের সাথে শুনেছিলেন এবং তা গ্রহণও করেছিলেন। সভাশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ছাত্র বহিষ্কার এবং ছাত্র নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্ররা যে শ্লোগান দিয়েছিলেন তাতে উপস্থিত জনতার সকলেই কণ্ঠ মিলিয়েছিলেন। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের নিকট এ খবর যথারীতিই পৌছে যায়। সরকার বুঝতে পেরেছিলেন যে, যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন ছাত্র সমাজের আন্দোলন, সে আন্দোলন জনগণের সমর্থন লাভ করেছে।

ফলে, পরদিন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন। কয়েকদিন পরে খন্দকার গোলাম মোস্তফা এবং আমাকে গ্রেফতার করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সরকার ছাত্রদের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মঘট বানচাল করার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু সফল হননি। মে মাসের শেষের দিকে বিশ্ববিদ্যালয় খুললো। কিন্তু একজন ছাত্রও ক্লাশে যোগ দিল না। ধর্মঘট চলতে থাকলো। প্রতিদিন ছাত্রসভা, মিছিল। এ সময়ে ছাত্রসভা, মিছিল ইত্যাদির নেতৃত্ব দিলেন সৈয়দ ইসতিয়াক আহমদ, কামরুজ্জামান, মোহাম্মদ সুলতান প্রমুখ। এদের নেতৃত্বে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব নূরুল আমিনের বাসভবন ঘেরাও করা হয়। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং পূর্বপাকিস্তান সরকার সংগ্রাম-কমিটির সঙ্গে মীমাংসায় আসতে বাধ্য হন। আমাদের বিরুদ্ধে যে বহিষ্কারের আদেশ ছিল তা' তুলে নেয়া হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাসমিতি পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো তা' সংশোধন করে বলা হল যে, কোনও সভা ডাকার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টরের অনুমতি নিতে হবে। বলতে গেলে, ১৯৫৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমন্ডিত হয়েছিলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ধর্মঘটের ইতিহাসে এটাই ছিল দীর্ঘতম ছাত্র-ধর্মঘট।

১৯৫৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-আন্দোলনের বিরাট প্রভাব পড়ে সারা পূর্ব-বাংলার ছাত্র সমাজের উপর। ফলে পূর্ব-বাংলার ছাত্র সমাজ সংগঠিত হতে থাকে। প্রতিটি কলেজে প্রতিটি জেলাতে দুটো ছাত্র-সংগঠন সুদৃঢ়ভাবে সংগঠিত হতে থাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন হয়ে দাঁড়ায় পূর্বপাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্বপাকিস্তান যুবলীগও সুদৃঢ়ভাবে সংগঠিত হয়। পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে যুবলীগের শাখা গঠিত হয় এবং যুবলীগের কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে। ১৯৫১ সালে যুবলীগের প্রতিষ্ঠা এবং বাহান্নোর ভাষা আন্দোলনের পরে

ছাত্র-ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা এ দুটো অসাম্প্রদায়িক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা স্বভাবতঃই এদেশে অসাম্প্রদায়িক ছাত্র-সংগঠনের অনুকূলে একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে। ফলে পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ তাদের সাধারণ অধিবেশনে 'মুসলিম' শব্দটি বর্জন করে 'পূর্বপাকিস্তান-ছাত্রলীগ' নাম গ্রহণ করে। জনাব কামরুজ্জামান পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। সুতরাং ভাষা আন্দোলন এবং তৎপরবর্তীকালের ছাত্র রাজনীতি, যুব রাজনীতি, দৃশ্যত অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে রূপ পরিগ্রহ করে।

পূর্বপাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্বপাকিস্তান যুবলীগ এবং পূর্বপাকিস্তান ছাত্রলীগ এ তিনটি অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উপর প্রচন্ড আঘাত আসে। সে আঘাত এদেশের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মুখপত্র 'মুসলিম লীগ' সামলাতে পারেনি। তার প্রমাণ পাই আমরা ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে। নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয় এবং মওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী ও শেরে-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। মাত্র কয়েকটি আসন ছাড়া সব কয়টি আসনেই যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। বোধহয় ৩১০টি আসনের মধ্যে মাত্র ৯টি আসন ছাড়া বাকী ৩০১টি আসনেই যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী জয়ী হন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনেই মুসলিম লীগের মৃত্যু ঘটে। বলা যেতে পারে, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকের কবর দেওয়া হয়েছিলো। অবশ্য এরপরে মার্শাল ল' জারী করে মুসলিম লীগের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তদানীন্তন পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সেটা মুসলিম লীগের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা বলা যায়না বরং বল যেতে পারে মুসলিম লীগের মৃতদেহকে নিয়ে সাড়ম্বরে মিছিল করা।

১৯৫৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর কয়েকদিন আগে সারা পূর্বপাকিস্তানে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। পূর্ববঙ্গ সরকার মনে করেছিল যে, হয়তো বা ২১শে ফেব্রুয়ারীকে উপলক্ষ্য করে বিরোধী দলের সংহতি জোরদার হবে। আর সেজন্যই এ নির্বিচার ধরপাকড়। কিন্তু ফল হল বিপরীত। সারা পূর্ব-পাকিস্তানব্যাপী সহস্র কর্মীকে গ্রেফতারের ফলে সারা দেশের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবির এটাও একটি কারণ।

২১শে ফেব্রুয়ারীর আগে ব্যাপক ধরপাকড় চালিয়েও ১৯৫৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী পালন থেকে এদেশের ছাত্র বা জনসাধারণকে সরকার বিরত রাখতে পারেনি। আমার মনে পড়ে, ১৯৫৪ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী আমাদের গ্রেফতার করা হয়। আমি তখন বগুড়ায়। ২০শে তারিখে সকালে জেলে বসে শুনলাম শুধু বগুড়াতেই নয় সারা পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যাপক ধরপাকড় হয়েছে। বগুড়াতে আনুমানিক ৭০ থেকে ৮০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যারা গ্রেফতার হয়েছিলেন তাদের মধ্যে একটা চিন্তাই ছিল যে, এবার বোধহয় ২১শে ফেব্রুয়ারী পালন করা হবেনা। কারণ, নেতৃস্থানীয় সব কর্মীই জেলে। বাইরে, আছে শুধু জালালউদ্দীন আকবর নামে আমাদের এক বন্ধু এবং অপর এক বন্ধু ফজলুর রহমান। বগুড়ায় তখন বলতে গেলে পুলিশী সন্ত্রাসের রাজত্বই চলছিল। সাধারণ কর্মীদের বাড়ী বাড়ী পুলিশ তল্লাশী চালাচ্ছিল। সাধারণ কর্মীরাও গা ঢাকা দিতে বাধ্য হয়েছে। নির্বাচন উপলক্ষে যে সর্বদলীয় কর্মীশিবির ছিল সেটা তালাবন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু ২১শের বিকেলে বগুড়ার জেলে বসে অবাক বিস্ময়ে শুনলাম মিছিলের গর্জন 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই', 'পুলিশী নির্যাতনের অবসান চাই'। ভাবছিলাম কে এ মিছিলের নেতৃত্ব দিলেন, কি করে এ মিছিল করা সম্ভব হলো ? রাতে এক জেল সিপাহী এসে খবর দিলেন যে বগুড়ায় এত বড় মিছিল এর আগে আর কখনও

হয়নি। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মিছিলের সামনে কে ছিলেন ?' সিপাহী নাম বলতে পারলো না। শুধু বললোঃ একটি বুড়ো লোক মাথায় ধবধবে সাদা চুল সাথে একটি মেয়ে; মেয়েটির হাতে একটি কালো পতাকা তারা মিছিলের আগে আগে চলছিল, আর পেছনে বিরাট মিছিল। সিপাহী আরও জানালো বুড়ো লোকটি নাকি এক উকিল সাহেব আর মেয়েটি তাঁরই ছোট মেয়ে। হ্যাঁ, সেদিন মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বগুড়ার সরকারী উকিল এবং উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রখ্যাত আইনজীবী সৈয়দ নওয়াব আলি সাহেব। সঙ্গে কালো পতাকা হাতে ছিল তাঁর ছোট্ট মেয়ে শামিম। মিছিল হবে না ভেবে তিনি উৎকণ্ঠিত ছিলেন। অবশেষে বিকেলে যখন মিছিল শুরু হলো তখন তাঁর ছোট মেয়ে শামিমের হাত ধরে তিনি এসে দাঁড়ালেন মিছিলের পুরোভাগে। সেদিনের সে জনসভায় সভাপতিত্বও করেছিলেন সৈয়দ নওয়াব আলী সাহেব। এ জন্য তাঁকে অনেক খেসারতও দিতে হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে ৯২(ক) ধারা প্রবর্তনের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং গ্রেফতারের আগে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কৈফিয়ত চাওয়ার ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'সরকারী উকিল হিসেবে কি করে আপনি সরকার বিরোধী মিছিলে যোগ দিলেন ?" তার উত্তরে হেসে তিনি বলেছিলেন, **'ইফ ইয়্যু ডোন্ট লাইক ইট, আই হ্যাভ মাই ওউন চয়েস। হিয়ার ইজ মাই রেজিগনেশন লেটার'**। একথাটুকু বলে তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র দাখিল করেছিলেন।

অবশ্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর পদত্যাগপত্র নেননি।হয়তো বা চক্ষুলজ্জায়। কিন্তু পরবর্তীকালে ৯২(ক) ধারার শাসনের সময়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এমনিভাবে শুধু বগুড়ায় নয়, সারা পূর্বপাকিস্তানে ১৯৫৪ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারী পালিত হয়েছিল। জনসাধারণ স্বতস্ফূর্তভাবে এতে যোগ দিয়েছিলেন।

১৯৫৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতেই যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে যায়। ২১শে ফেব্রুয়ারীতে জনতা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে নির্বাচনে তারা তাঁদের চূড়ান্ত রায় দেন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হল। পর্যায়ক্রমে জেলখানা থেকে আমরা ছাড়া পেলাম।

১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা কার্জন হলে পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনের সভাপতিমন্ডলীর মধ্যে ছিলেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্,ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন এবং আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। এ সাহিত্য সভাতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল যোগ দেন। সারা দেশে যেন একটি গণসঙ্গীতের জোয়ার বয়ে যায়। এখানে আর একজনের নাম উল্লেখ্য। যাদের আমি পরবর্তী সময়ে ১৯৫৪-৫৫ সালে ঢাকা জেলে পেয়েছিলাম। তিনি হলেন রমেশ শীল। চট্টগ্রামের বিখ্যাত কবিয়াল। তিনি তাঁর কবি গানের মাধ্যমে এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলায় যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। ফলে, পূর্বপাকিস্তান সরকারের হাত থেকে তিনিও নিস্তার পাননি। ১৯৫৪ সালের ২৫শে মে'র পরে তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়। তিনি প্রায় বছরকাল জেলে ছিলেন।

যুক্তফ্রন্টে বাতিল করে ৯২(ক) ধারা জারী হওয়ার পরে আবার সারা পূর্বপাকিস্তানে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। কয়েক সহস্র কর্মী, নেতা গ্রেফতার হন। বগুড়াতে গ্রেফতার করে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় রাজশাহী জেলে। সেখান থেকে আবার নিয়ে আসা হয় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। আমাদের রাখা হয় পুরনো হাজতে। সেটি জেলের মধ্যে আর একটি জেল। জনাব মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক অজিত গুহ, রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, বাবু চন্দ্রশেখর, অমূল্যকাঞ্চন রায়, চাখার কলেজের অধ্যক্ষ রফিক, বাবু নারায়ণ বিশ্বাস, অমিয় দাশগুপ্ত, এসএ বারি এ টি, লতিফ

(বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক)' জুলমত আলী খান, আমরা সবাই একসঙ্গেই ছিলাম। আমি ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলে আসার কিছুদিন পর মুনীর চৌধুরী মুক্তিলাভ করেন এবং তার পরপর জুলমত আলি খানও মুক্তিলাভ করেন।

১৯৫৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে আমরা পুরনো হাজতে। দেশে তখন এক স্বেচ্ছাচারী শাসন চলছে। কয়েক হাজার কর্মী জেলে আটক অথবা আত্মগোপন করে আছেন। এমতাবস্থায়, ২১শে ফেব্রুয়ারী যথাযথভাবে প্রতিপালিত হবে কিনা স্বভাবতই মনে প্রশ্ন ছিল। কিন্তু আমাদের এ ধরনের সন্দেহকে অমূলক ও ভ্রান্ত প্রমাণ করে দিয়ে ২০শে ফেব্রুয়ারী গভীর রাতে সমস্ত ঢাকা শহর শ্লোগানের পর শ্লোগানে গর্জে উঠলো। বাংলা ভাষার দাবীতে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবীতে সেদিন ঢাকার বুকে গণকণ্ঠের ঢল নেমেছিল। স্বভাবতই বুঝতে পারলাম আবার আগামীকাল ব্যাপক ধরপাকড় হবে। আমাদের এ ধারণাকে সত্য প্রমাণ করে দেখা গেল ২১শে ফেব্রুয়ারী বিকেল বেলা দলে দলে ছাত্রদেরকে জেলখানার গেট দিয়ে ভিতরে ঢোকানো হচ্ছে। পুরনো হাজত থেকে জেলখানার গেটটি দেখা যায়। দরজায় দুটো গোল ছিদ্র ছিল। যেহেতু আমি এবং এস এ বারী ছাত্রদের চিনতাম সেহেতু আমরা দু'জন সেই ছিদ্র দুটোতে চোখ লাগিয়ে বসে রইলাম। দেখলাম, ডাক্তার আলিমকে (বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় হানাদার বাহিনী যাঁকে হত্যা করে) তাঁর সাথে আরও একজন ইব্রাহিম তাহা, তাঁরা ধীর পায়ে গেট দিয়ে ঢুকছেন। তারপর দেখলাম আরও অনেকেক। তাঁদের মধ্যে ফরমান উল্লাহ খান, জনাব এম এ মুহিত, জনাব এম এ আশরাফ, কাশেম, আবদুল মোমেন তালুকদার, সিদ্দিকুর রহমান, সাদ আহমদ, কে জেড আলম, মোহাম্মদ আনসার আলি, মোকাম্মেল হক,আবদুল গাফফার চৌধুরী, শামসুল আরেফিন, ফজলুল হক, আবদুল মান্নান হাওলাদার, কামালউদ্দিন, আবদুল মান্নান শিকদার, আবুল কাশেম, জামিল, একরামুল হক, ওয়াজিউল্লাহ- এঁরা সব দলে দলে ঢুকছেন। আরও অনেকেই সেদিন গ্রেফতার বরণ করেন সত্যাগ্রহ করে। জেলখানায় জায়গা নেই। জেলখানার ১ ও ২ খাতাতে যাঁরা রাজবন্দী ছিলেন তাঁদের সরানোর ব্যবস্থা নেওয়া হলো, ৩ ও ৪ খাতা থেকে কয়েদীদের সরিয়ে নেওয়া হলো। এমন সময় জেলার দৌড়তে দৌড়তে আমাদের কাছে এলেন এবং আমাদের পুরনো হাজত ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন। আমরা তার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জানালেন যে মেয়েদের গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয়েছে, তাদের রাখার জায়গা নেই। আমরাও জানালাম যে যদি জেলখানায় জায়গা না থাকে তবে যাঁদের আটক করা হয়েছে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হোক। জেলার কাতরভাবে জানালেন যে তিনি ছেড়ে দেবার মালিক নন। তবে আমরা যদি পুরনো হাজত ছেড়ে দিই তবে এখানে মেয়েদের থাকার জায়গাটা ভালো এবং নিরাপদ হয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে পুরনো হাজত খুব সুরক্ষিত এলাকা। অনেকেটা বাড়ীর মতো। শুধুমাত্র প্রথম শ্রেণীর বন্দীদের এখানে রাখা হয়েছিল। তখন রাজবন্দীদের মধ্যে দুটো শ্রেণী ছিল— প্রথম শ্রেণীর রাজবন্দী এবং সাধারণ রাজবন্দী বা ২য় শ্রেণীর রাজবন্দী। অনেকদিন থেকেই এ পুরনো হাজতে রাজবন্দীরা থাকতেন। জেলারের সঙ্গে আমরা দর কষাকষি শুরু করলাম, বললাম পুরনো হাজত আমরা ছাড়ব না। আমাদের এ কথায় জেল কর্তৃপক্ষ খুব বেকায়দায় পড়ে গেলেন। সুতরাং আমরা শর্ত দিলাম, পুরনো হাজত ছাড়তে আমরা রাজী আছি যদি ১ ও ২ খাতার রাজবন্দী এবং আমাদের এক জায়গায় রাখা হয়। কিন্তু জেলে সে ধরনের বিশেষ জায়গা না থাকায় জেলার তাঁদের অক্ষমতার কথা জানালেন। পরে আমরা বললাম আমরা অন্য জায়গায় যেতে পারি তবে আমাদের সকলকে এক এলাকার মধ্যে রাখতে হবে

যাতে আমাদের একে অপরের সাথে কথা বলায় বা চলাফেরায় কোনও অসুবিধা না হয়। কিন্তু অফিসিয়ালী এতেও জেল কর্তৃপক্ষ রাজী হতে পারলো না। কারণ আমাদের এ প্রস্তাব জেলের আইন কানুনের বিরোধী। সরকারী নির্দেশ ছিলো যাতে আমরা এবং অপর রাজবন্দীরা একে অপরের সাথে মিশতে না পারি। কিন্তু আমরা যখন জানালাম যে শর্ত না মানলে পুরনো হাজত আমরা কিছুতেই ছাড়তে পারি না। তখন জেল কর্তৃপক্ষ মৌখিকভাবে স্বীকার করলেন যে, আমরা এক এলাকায় থাকব, একসাথে খেলাধূলাও করতে পারব। তবে আমাদের এক রাজবন্দীর সাথে অপরের যে কথাবার্তা হবে তা হবে জেল কর্তৃপক্ষের অগোচরে অর্থাৎ জেল কর্তৃপক্ষ দেখেও দেখবেন না। আমরা দেখলাম মন্দের ভালো। সুতরাং এ ব্যবস্থায় আমরা রাজী হয়ে গেলাম। ফলে, আমাদের সকল পুরনো রাজবন্দীকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের দেওয়ানী, ৪০সেল, পুরানো ২০সেল, নতুন ২০ সেল, ৬ এবং ৭ সেল এলাকাতেই রাখা হলো। কোনও কোনও সেলে ২/৩ জন করে থাকার ব্যবস্থা করা হলো। যা হোক, এ চুক্তির ফলে আমরা তোয়াহা সাহেব, খাজা আহমদ সাহেব, প্রসূনকান্তি রায়, চট্টগ্রাম নোয়াখালী, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন রাজবন্দীদের এবং সরদার ভাইকে (সরদার ফজলুল করিম) দেখতে পেলাম। অবশ্য এসে লজ্জিতই হলাম।

১৯৫৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর আন্দোলন যেমন দেশের চেহারাটুকু বদলিয়ে দেয় ঠিক তেমনি ভাবে জেলখানার ভেতরের অবস্থারও কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। ফলে, আমরা জেলখানায় কিছু অধিক সুযোগ-সুবিধা পেতে থাকি।

৫৫সালে'র ২১শে ফেব্রুয়ারী যখন ছাত্রদের জেলখানায় দলে দলে ঢুকানো হচ্ছিল তার কিছুক্ষণ আগে জেলখানার ভেতরে আমাদের ২১শে ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠান শেষ হয়। আমরা সেখানে একটি ছোটখাট অনুষ্ঠান করেছিলাম। এখানে বলা প্রয়োজন, ২১শে ফেব্রুয়ারীতে রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ ও বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি যে কর্মসূচী নিতেন আমরা জেলখানায় সে কর্মসূচী পালন করতাম। খালি পায়ে থাকার নির্দেশ, রোজা রাখার নির্দেশ- সবই আমরা পালন করতাম। জেলখানার ভেতরেও আমরা সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্ব মেনে চলতাম।

১৯৫৫ সালে যে ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রতিপালিত হয় তা' সর্বদলীয় রাষ্টরভাষা কর্ম-পরিষদের উদ্যোগে পালিত হয়নি, তা' বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির উদ্যোগে হয়েছিল। সেদিনকার সে রাষ্ট্রভাষা দিবস উদযাপনের কৃতিত্বের যদি কেউ দাবী করতে পারেন তবে সে কৃতত্বের দাবীদার হলেন পূর্ব-বাংলার ছাত্র সমাজ। কারণ, সেদিনও যেসব নেতা বাইরে ছিলেন তাঁরা ২১শে ফেব্রুয়ারী উদযাপনের নির্দেশ দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এখানে বলা প্রয়োজন, মওলানা ভাসানী ছিলেন তখন ইউরোপ।

১৯৫৫ এর ২১শে ফেব্রুয়ারীতে অনেক ছাত্রীকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ফরিদা বারি, কামরুন নাহার লাইলি, জনাব তাহা সাহেবের স্ত্রী ফিরোজা বেগম, জহরত আরা, মেডিকেল কলেজের দু'জন ছাত্রী, এবং আরও কয়েকজন তাঁদের নাম আজ আর স্মরণ করতে পারছি না।

জেলখানার ভেতরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাবার জন্য সরকার চেষ্টা করেছিলেন। অভিভাবক এবং আত্মীয়স্বজনদের নিকট থেকে বন্ড নিয়ে তাঁদের ছেলে বা মেয়েকে জেল থেকে বের করানোর জন্য সরকার বিশেষভাবে চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম দিকে কিছু কিছু ছাত্রদের মধ্যে বন্ড দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। অবশ্য ছাত্রনেতা ডাক্তার আলিম, ইব্রাহিম তাহা, আবদুল মোমেন তালুকদার, মুহিত, শামসুল হক, আশরাফ, কাশেম এ ধরনের নেতৃস্থানীয়

ছাত্ররা চেষ্টা করছিলেন যাতে বন্দী ছাত্রেরা বন্ড না দেন। তবুও দেখা যাচ্ছিল যে দু'একজন স্কুলের ছাত্র বন্ড দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

ভাষা আন্দোলনে গ্রেফতারকৃত ছাত্রবন্দীদের সাথে আমাদের দেখা করতে দেওয়া হতো না। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, যে কোন উপায়েই হোক, ছাত্রবন্দীদের সঙ্গে আমাদের একজনকে দেখা করতেই হবে। আমাকেই ছাত্রবন্দীদের সাথে দেখা করার দায়িত্ব দেওয়া হলো। কিন্তু কিভাবে দেখা করা যায় ? শেষ পর্যন্ত অসুখের ভান করে ডাক্তার হাসনাতকে দিয়ে জেল হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা হলো। জেল হাসপাতালে গিয়ে দেখি অসুস্থ হয়ে কয়েকজন ছাত্র জেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে কাউকেই চিনি না। একজন ছাত্র এগিয়ে এলেন, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, নাম মোকাম্মেল হক। মোকাম্মেল হক ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রদের একজন। কিছুক্ষণের মধ্যে যাঁরা জেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তাঁদের সাথে আলাপ জমে উঠলো। একটি ছোট ছেলে ছিল নাম ওবায়দুর রহমান। পগোজ স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। তার চাচা ছিলেন ঢাকা কোর্টের মুন্সেফ। ২১শে ফেব্রুয়ারীতে সেও গ্রেফতার হয়ে আসে। ছেলেটি খুবই মিষ্টি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলেই যেন আপনার হয়ে গেল।

পরের দিন বিকেলে ওবায়েদ ছুটতে ছুটতে এলো। তাকে জেল গেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। শুনলাম তার চাচা জেল গেটে এসেছিলেন তাকে বন্ড দিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু সে জেল থেকে বন্ড দিয়ে যেতে রাজী হয়নি। ফলে, তার চাচা জেলারের সামনে তার গালে একটা চড় কষে দিলেন। কিন্তু চাচা যখন কাগজ কলম নিয়ে বন্ড লিখতে যাচ্ছিলেন এমনি সময় ওবায়দুর জেলগেট দিয়ে (জেল গেট দিয়ে তখন কয়েদী ঢুকানো হচ্ছিল) গলিয়ে ছুটতে ছুটতে ভেতরে চলে আসে। কিছুক্ষণ পরে জেলগেট থেকে জমাদার এলো তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ওবায়দুর জানালো সে যাবে না এবং বন্ড দেবে না।

আমি যেদিন জেল হাসপাতালে যাই তার পরদিন ভোরে ডক্টর আলিমকে জেল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তাঁর সামান্য সর্দি-জ্বর হয়েছিল। ডাক্তার আলিম এবং আমি আলোচনা করছিলাম কি করে ছেলেদের মনোবলকে দৃঢ় রাখা যায়। ছেলেদের অভিভাবকদেরকে ভয়ভীতি দেখিয়ে বন্ড নেওয়ার যে চক্রান্ত চলছে তাকে কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়। আলোচনার পর ডাক্তার আলিম সেদিন বিকেলেই ডিসচার্জ হয়ে আবার চলে যান। তিনি যাওয়ার সময় বলে গেলেন যে ৩ ও ৪ খাতায় যেসব বন্দী আছে তাদের সাথেও এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করবেন। এবং এ বিষয়ে লিখে জানাবেন।

পরদিন মোকাম্মেলের জ্বর প্রায় ১০৩ বা ১০৪। ডাক্তার এসে দেখে বললেন যে ভয়ের কোনও কারণ নেই। তার মাম্‌স হয়েছে, জ্বর ছেড়ে যাবে।সে দিনই একটি ঘটনা ঘটে গেলো। ঘটনাটি সামান্য হলেও এর একটি সুদূরপ্রসারী ফল ঘটে।

মোকাম্মেলের পিতা ছিলেন কবি মোজাম্মেল হক সাহেব। তিনি মোকাম্মেলকে দেখতে এসেছিলেন। যখন শুনলেন যে মোকাম্মেল অসুস্থ অবস্থায় আছে তখন তিনি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। ঐ সময় কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের আই বি বিভাগের যেসব অফিসার জেল গেটে ছিলেন তারা মোজাম্মেল হক সাহেবকে বোঝাতে লাগলেন যে মোকাম্মেল খুব ভালো ছাত্র। সে সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করবে। তাকে এভাবে জেলে রেখে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করা ঠিক নয়। একটি বন্ড দিয়ে যেন তাকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়। অসুস্থ অবস্থায় বন্ড দিলে তার কোনও ক্ষতি হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

কবি মোজাম্মেল হক সাহেব ছিলেন সহজ, সরল মানুষ। তিনি কিছুটা নমনীয় হয়ে পড়েছিলেন। বিকেল তখন ৪টা হবে। জেলগেট থেকে একজন কর্মচারী আমাকে এসে বললেন যে মোকাম্মেল সাহেবের পিতা এখানে আসছেন তাকে বন্ড দিতে রাজী করানোর জন্যে। তাঁর সাথে জেলখানার এ্যাংলো সার্জেন্টও আসছেন। খবরটি দিয়ে কর্মচারী ভদ্রলোক সরে গেলেন। আমরা বসে আছি। মোকাম্মেল খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সে আমাকে ডেকে বলে,"গাজী ভাই, আপনি এখান থেকে যাবেন না। আমি কিছুতেই বন্ড দেবো না"।

একটু পরেই মোকাম্মেলের আব্বা এলেন, সাথে সেই এ্যাংলো সার্জেন্ট। আমি কবিকে সালাম দিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি মোকাম্মেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দু'চোখ পানিতে ভরে উঠেছে। মোকাম্মেলের পাশে বসলেন তিনি। মোকাম্মেলের তাপদগ্ধ হাতটি ধরে তিনি বললেন যে, "অনেক হয়েছে, এখন চল্। আমি তোকে নিয়ে যেতে এসেছি"। মোকাম্মেল শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তিনি বোঝাতে শুরু করলেন যে, বন্ড দিলে কোনও ক্ষতি নেই। মোকাম্মেল হঠাৎ বলে উঠলো যে, "আব্বা, আমি বন্ড দেবো না। আমার কেমন লাগছে, আমার কেমন লাগছে। গাজী ভাই, আমাকে পানি দেন"। আমি তাড়াতাড়ি সামনে এসে এ্যাংলো সার্জেন্টকে কড়া ধমক দিয়ে সরিয়ে দিয়ে মোকাম্মেলের মাথায় পানি ঢালতে লাগলাম। কিছুপর মোকাম্মেলের আব্বা আমাকে ডাকলেন। আমি নিকটে যেতেই তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে ?" আমি বললাম, "চাচাজান, আমাকে আপনি বলবেন না, 'তুমি' বলে বলবেন। আমার নাম গাজীউল হক। আমিও রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে আছি। আমি কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছি।" তিনি চুপ করে থাকলেন। তাঁর দু'চোখ থেকে পানি পড়লো। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন যে, "ছেলেকে আল্লাহ্‌র হাওলা করে গেলাম। আপনি একটু দেখবেন, বাবার মন তো মানে না, সেজন্য এসেছিলাম।" আমি তাঁকে সালাম জানালাম। তিনি মোকাম্মেলের কপালে হাত দিয়ে দোয়া পড়ে ধীরে ধীরে বের হয়ে গেলেন। তখনো বারান্দায় তাঁর আব্বার পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায়নি, মোকাম্মেল চোখ খুলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাঁর জ্বরতপ্ত ঠোঁটে মিষ্টি হাসি। জিজ্ঞেস করলো, "আব্বা চলে গেছেন" আমি বললাম, "হ্যাঁ"। সেদিন আবেগে মোকাম্মেলকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। বুকটি সেদিন আমার ভরে উঠেছিল।

যাঁরা সেদিন জেলে গিয়েছিলাম—মোকাম্মেল, এ টি এম শামসুল হক, ডাক্তার আলিম, তাহা, আনোয়ারুল আজিম—এঁরা সেদিনের রাজনৈতিক শূন্যতার মধ্য দিয়েও ২১শে ফেব্রুয়ারীর মর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে, ভাষার দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন কারাবরণ করেছিলেন। তাঁদের সকলের মুখগুলো আমি মোকাম্মেলের মুখে দেখলাম।

পরদিন থেকে মোকাম্মেলের জ্বর কমতে থাকে। কিন্তু আমাকে জেল হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করা হলো। জেল কর্তৃপক্ষ এ্যাংলো সার্জেন্টের কাছ থেকে রিপোর্ট পায় যে আমি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই জেল হাসপাতালে এসেছি, ভাষা আন্দোলনের ছাত্রবন্দীদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। অসুস্থ মোকাম্মেল বন্ড দিতে অস্বীকার করেছে তার আব্বার অনুরোধ সত্ত্বেও-এ খবর আমি একটি চিঠি দিয়ে জেল হাসপাতাল ছাড়ার আগেই ডাক্তার আলিম এবং অন্যান্যদের জানিয়ে দিয়েছিলাম। এর ফলশ্রুতিতে স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও ছাত্রই আর বন্ড দেয়নি। শত চাপের মুখেও এসব ছাত্রবন্দীরা নতি স্বীকার করেনি। ফলে সরকারকেই ছাত্রদের কাছে নতি স্বীকার করতে হলো। এবং কিছুদিনের মধ্যে ভাষা আন্দোলনে

আটককৃত সকল ছাত্রবন্দীকে মুক্তি দিতে হলো। আবার আমরা দেখলাম, আমাদের ছাত্রবন্ধুরা সগৌরবে বেরিয়ে যাচ্ছে। ১৯৫৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী আন্দোলন ছিল ছাত্রদের এক অসীম সাহসিকতার নিদর্শন—তাঁদের সংগ্রামী মানসিকতার নিদর্শন। সে আন্দোলনে সম্পূর্ণ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ছাত্ররা।

১৯৫৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর আন্দোলন ৯২(ক) ধারার শাসন চূড়ান্তভাবে ফাটল ধরালো। পাকিস্তান সরকাল পুরোপুরি বুঝতে পারলো ভাষা আন্দোলনকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। রাষ্ট্রভাষার দাবীকে স্বীকার করে নিতেই হবে। শুধু তাই নয়, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে তাদের আপোষ করতে হবে। আমি এই কথা স্পষ্টভাবেই বলতে চাই যে, ১৯৫৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী আন্দোলনের ফলশ্রুতিতেই ৯২(ক) ধারার অবসান ঘটে। এ আন্দোলনের ফলেই আবার যুক্তফ্রন্টকে মন্ত্রীসভা গঠন করতে আহ্বান জানানো হয়। এবং জনাব আবু হোসেন সরকারের দল সে সুযোগ গ্রহণ করে। যদিও পাকিস্তান সরকার সে সময় যুক্তফ্রন্টের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছিল তবুও ক্ষমতা ১৯৫৪ সালের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই ছেড়ে দিতে হয় এবং কিছুদিন পরই প্রায় সব রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হয়। পাকিস্তান সরকারের মনে এ ধারণা দৃঢ় হয়ে জন্মে ছিল তেয ভাষার প্রশ্নে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিটি লোকই আপোষহীন। সুতরাং তাদের সাথে বসতে হলে প্রাথমিক শর্ত হবে ভাষার দাবীকে স্বীকার করে নেওয়া। ফলে, ১৯৫৬ সালে যে সংবিধান রচিত হলো সে সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হলো। সফল হলো শহীদের রক্ত দেয়া, সফল হলো বাংলা ভাষার সংগ্রাম।

ছাত্র বন্ধুদের মুক্তির পর আমরা আবার পুনর্মুষিকভব। অর্থাৎ যে যার যথাস্থানে। যাওয়ার আগে আমরা সকল রাজবন্দী মিলে এক অনুষ্ঠান করলাম। অনুষ্ঠান শেষে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো পুরনো হাজতে। পুরনো হাজতের দেয়ালে দেয়ালে দেখি ভাষার দাবীতে শ্লোগান। আবার কোথাও লেখা 'আর কতদিন এ দেশের মানুষের দাবীকে অস্বীকার করবে তোমরা', 'এ দেশের মুক্তি আসবে কবে'; তার নীচে রাজবন্দী বোনদের নাম স্বাক্ষর।

আমি ঘুরে দেয়ালের লেখাগুলো পড়ছিলাম। আমার সাথে ছিলেন এস এ বারি ও আবদুল লতিফ (অধ্যাপক)।একসময় লতিফ বললো,'গাজী ভাই আর চিন্তা নাই। এদেশের ছাত্রীরা যখন সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করতে শিখেছে, জেলখানার দেয়ালে তাদের মনের কথাটুকু লিখে যেতে পেরেছে তখন আমাদের মুক্তি আসন্ন।' আবেগে উত্তেজনায় আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছি। আনন্দের আতিশয্যে আমাদের চোখে পানি এসেছিল সেদিন। আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন রণেশদা, সত্যেনদা, চন্দ্তশেখর বাবু, নারায়নদা, অমিয় দাশগুপ্ত, কানু রায় প্রমুখ।

ভাষা আন্দোলন কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ আন্দোলন ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। ১৯৪৭ সালে এ আন্দোলনের বুনিয়াদ রচনা হয়। ১৯৪৮-এ আন্দোলনের অঙ্কুরোদগম হয়। ১৯৫২ সালে এ আন্দোলন এক বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়। ১৯৫৫ সালে এ আন্দোলনের ফল লাভ হয়। সুতরাং স্তরে স্তরে ভাষা আন্দোলন এগিয়ে গেছে। শুধু ভাষা আন্দোলন এগিয়ে যায়নি সঙ্গে সঙ্গে একুশের আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে গেছে এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে। ১৯৪৮ সালে যে আন্দোলনের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল, ১৯৫২ সালে সে ভাষা আন্দোলন বিরাট প্রসার লাভ করেছিল। ভাষার জন্যেই এ দেশের মানুষ প্রথম বুকের রক্ত দিলো। ঢাকার রাজপথের কৃষ্ণচূড়ার সাথে রঙ মিশিয়ে ঢাকার কালো রাজপথ বুকের রক্তে রাঙ্গিয়ে দিল।

২১শে ফেব্রুয়ারী গোটা জাতির জন্যে একটা পবিত্র দিবস। সুতরাং ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু করে প্রতি বছর যে ২১শে ফেব্রুয়ারী এসেছে তা এসেছে এক পবিত্রতা নিয়ে। এদেশের মানুষের সামনে এক অঙ্গীকার নিয়ে, এক পবিত্র সংগ্রামের অঙ্গীকার। এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ২১শের ভাষা আন্দোলন থেকেই রস সংগ্রহ করে পুষ্ট হয়েছে, বৃদ্ধি লাভ করেছে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত প্রতিটি ২১শে ফেব্রুয়ারী এদেশের মানুষকে উদ্দীপ্ত করেছে, প্রেরণা যুগিয়েছে। আমাদের মুক্তির সংগ্রাম হলো আমাদের ভাষার সংগ্রাম; আমাদের সংস্কৃতির সংগ্রাম; আমাদের ঐতিহ্যের সংগ্রাম। ১৯৫২ সালের মহান একুশের আন্দোলনের ক্রম পরিণতিতে এদেশ স্বাধীন হয়েছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখা চিহ্নিত হয়েছে। এদেশের মানুষ একটি পতাকা লাভ করেছে। একটি জাতীয় সংগীত লাভ করেছে। একটি স্বাধীন অস্তিত্বঅর্জন করেছে। ভাষা আন্দোলনে যাঁরা ১৯৪৭ সাল থেকে অংশ গ্রহণ করেছেন, ভাষা আন্দোলনে যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন, যাঁরা ভাষা আন্দোলনে আমাদের সাথী ছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আমার ভালোবাসা জানাচ্ছি।

ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নিজের অক্ষমতার জন্যে ক্ষমা চাইছি। আমি লজ্জিত। যদি আরও কিছুদিন আগে এ স্মৃতিচারণের সুযোগ পেতাম তাহলে হয়তো আরও অনেক বন্ধুকে আমার স্মৃতিচারণের মাঝে ধরে রাখতে পারতাম। কিন্তু এ ত্রুটি আমার ইচ্ছাকৃত নয়, আমার অপারগতার জন্যে। আজও এ স্মৃতিচারণ সম্ভব হতো ন, যদি না বাংলা একাডেমীর অফিসার সুকুমার বিশ্বাস দীর্ঘদিন ধরে ধৈর্যের সঙ্গে এ সাক্ষাৎকার না নিতেন। তাঁকে ধন্যবাদ। (বাংলা একাডেমীর একুশের সংকলন' ৮০ থেকে গৃহীত)

ভাষা আন্দোলনের পটভূমি এবং রক্তাক্ত একুশের ঘটনাপঞ্জি

এম আর আখতার মুকুল

পূর্বকথা— দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তর বছরটা হচ্ছে ১৯৪৫ সাল। তখন এই উপমহাদেশের সবটুকু এলাকাই বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু এদেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন আরও রক্তক্ষয়ী ও ভয়ংকর আকার ধারণ করার আগেই ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করে। এসময় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাগের দাবী উথাপন করে ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট "সংগ্রাম দিবস"

পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এদিন থেকে কলকাতায় শুরু হয় সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্যতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ঐতিহাসিকরা এই দাঙ্গার নামকরণ করেছে, "কলকাতার ভয়াবহ নিধন যজ্ঞ" (দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং)। অল্প দিনের ব্যবধানে এই দাঙ্গা সমগ্র উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং দ্রুত ঘটনা প্রবাহের অবতারণা হয়। ফলে এক হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত দু'টো এলাকা নিয়ে শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামে একটা রাষ্ট্র সৃষ্টি অবধারিত হয়ে উঠে।

ঠিক এমনি সময়ে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রভাবশালী সদস্য এবং পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর চৌধুরী খালেকুজ্জামান দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদে আয়োজিত উর্দু সম্মেলনে ১৯৪৭ সালের ১৭ইমে তারিখে ঘোষণা করলেন, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ভাষা।"

এরপর ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ভারতের আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর জিয়াউদ্দীন আহমদ এমর্মে বিবৃতি দিলেন যে, 'উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করা উচিৎ'। ফলে বাংগালী মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। জ্ঞান তাপস ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার পক্ষে সোচ্চার হলেন। ১৯৪৭ সালের ২৯শে জুলাই দৈনিক আজাদে তিনি স্ব-নামে প্রবন্ধ লিখলেন, "পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা"। তাঁর বক্তব্যের মোদ্দা কথা হচ্ছে প্রস্তাবিত পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বাংগালীদের মাতৃভাষা বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। তিনি মন্তব্য করলেন, "যদি এর পরেও অন্য কোন ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার প্রশ্ন আসে, শুধু তাহা হইলেই উর্দুর কথা চিন্তা করা যাইতে পারে"।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিশের পক্ষ থেকে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, বাংলা না উর্দু' ?—এই শিরোনামায় একটা পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এতে এককালীন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক এবং পরবর্তীকালে রাজনীতিবিদ্ আবুল মনসুর আহমদ এবং মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন ডক্টর কাজী মোতহার হোসেনের লেখা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই দু'টি নিবন্ধেই বাংলাভাষার পক্ষে জোরালো যুক্তি উত্থাপন করা হয়। অন্যদিকে ১৯৪৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে করাচীতে অনুষ্ঠিত উর্দু সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে তৎকালীন মুসলীম লীগ মন্ত্রীসভার বাংগালী শিক্ষামন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমান উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য সরকারের কাছে জোর সুপারিশ করেন।

এই সুপারিশের কথা সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে মারাত্মক ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ১৯৪৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে সর্বজনাব মুনীর চৌধুরী (একাত্তরে শহীদ), আব্দুর রহমান চৌধুরী (প্রাক্তন বিচারপতি), কল্যাণ দাসগুপ্ত, ফরিদ আহমদ (পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ভূমিকার জন্য একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত) এবং এ কে এম আহসান (বর্তমান অবসরপ্রাপ্ত সি এস পি)। সভাশেষে ছাত্রদের এক বিক্ষুব্ধ মিছিল তৎকালীন প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার সদস্য নুরুল আমিন ও সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল এবং মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনের সংগে সাক্ষাত করলে এঁরা সবাই রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দান করেন।

এই ঘটনার মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে ১২ই ডিসেম্বর ঢাকার পলাশী ব্যারাক এলাকায় বাংলা ও উর্দু ভাষা সমর্থকদের মধ্যে এক সংঘর্ষে ২০ ব্যক্তি আহত হয়। এদিন ছাত্র-জনতার এক বিরাট শোভাযাত্রা সেক্রেটারিয়েটের চারদিকে বাংলাভাষার স্বপক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

জ্ঞানতাপস ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ভাষা সমস্যা সম্পর্কে দৈনিক আজাদে এসময় আরও একটি প্রবন্ধ লেখেন। ২১শে ডিসেম্বর আজাদে প্রকাশিত এই প্রবন্ধে ডঃ শহীদুল্লাহ লিখলেন, যাঁহারা বাংলাদেশে বাংলা ভাষাকে ছাড়িয়া কিংবা বাংলার স্কুল-কলেজে শিক্ষার মাধ্যম (মিডিয়াম) রূপে উর্দুর পক্ষে ওকালতি করিতেছেন, আমি তাহাদিগকে কান্ডজ্ঞানবিহীন পন্ডিতমূর্খ ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারিনা।

প্রথম ভাষা আন্দোলন— ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে করাচীতে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশন চলাকালে কুমিল্লার কৃতি সন্তান এবং কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত পরিষদ সদস্য বাবু ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত (একাত্তরে পাক বাহিনীর হাতে নিহত) সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী উত্থাপন করেন। পূর্ব বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যরা এই প্রস্তাব সমর্থন করাতো দুরের কথা, বরং সক্রিয় ভাবে এর বিরোধিতা করেন।

ফলে ২৬শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ঢাকায় মুনীর চৌধুরী , আব্দুর রহমান চৌধুরী, এ কে এম আহসান, কল্যাণ দাসগুপ্ত, মোহাম্মদ তোয়াহা (বামপন্থী নেতা), নঈমুদ্দীন আহমদ (পূঃ পাঃ ছাত্র লীগ), ফরিদ আহমদ, আখলাকুর রহমান (পরবর্তীকালে অধ্যাপক ও ব্যাঙ্কার), আজিজ আহমদ (মরহুম), শামসুল হক (ডেমোক্রেটিক লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। মস্তিষ্কের ভারসাম্য বিনষ্ট অবস্থায় ও অনাহারে মৃত্যু), অধ্যাপক আবুল কাশেম (তমদ্দুন মজলিশ), সরদার ফজলুল করিম (কম্যুনিষ্ট পার্টির এককালীন সদস্য এবং পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক), শেখ মুজিবুর রহমান (পূঃ পাঃ ছাত্র লীগ), শহীদুল্লাহ কায়সার (পরবর্তীকালে লেখক ও সাংবাদিক এবং একাত্তরে শহীদ), অধ্যাপক নুরুল হক ভুঁইয়া (তমদ্দুন মজলিশ), মরহুম কমরুদ্দীন আহমদ (চুয়ান্নো সালে যুক্তফ্রন্টের দফতর সম্পাদক ও পরবর্তীতে কিছুদিনের জন্য রাষ্ট্রদূত), তাজউদ্দীন আহমদ (একাত্তরে মুজিবনগর সরকারের প্রধান মন্ত্রী ও পঁচাত্তরে কারাগারে নিহত), মরহুম মোল্লা জালালউদ্দীন (আওয়ামী লীগের প্রাক্তন মন্ত্রী), এবং এ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ চৌধুরী (বি এন পি আমলে রাষ্ট্রদূত) প্রমুখ ছাত্র হিসাবে বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বিশেষ তৎপর ছিলেন।

জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থীরা এসময় আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসেন। ফলে রাজশাহীতে মরহুম আতাউর রহমান (পরবর্তীতে বিশিষ্ট ন্যাপ নেতা), মরহুম গোলাম রহমান, মরহুম মোহাম্মদ সুলতান (পরবর্তীতে ভাসানী ন্যাপের বিশিষ্ট নেতা), একরামুল হক (বর্তমানে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বি এন পি নেতা), ও আবুল কাশেম চৌধুরী, সিলেটের নুরুর রহমান (সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার ষ্টেট মন্ত্রী), আব্দুস সামাদ (পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী), মাহমুদ আলী (একাত্তর সাল থেকে রাজনৈতিক কারণে পাকিস্তানী নাগরিক) ও হাজেরা মাহমুদ, বগুড়ায় কবি আতাউর রহমান (বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক), আব্দুল মতিন (বামপন্থী নেতা), জালালউদ্দীন আকবর (বামপন্থী নেতা), শ্যামাপদ সেন, মাজহারুল ইসলাম ও গাজীউল হক (বর্তমানে এ্যাডভোকেট), দিনাজপুরে মরহুম দবিরুল ইসলাম, মুস্তফা নুরউল ইসলাম (বর্তমানে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক), আব্দুল হক (বর্তমানে এ্যাডভোকেট), মতিউর রহমান চৌধুরী (বর্তমানে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী) ও এম আর আখতার মুকুল (একাত্তরে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান 'চরমপত্রের লেখক ও কথক), রংপুরে মতিউর রহমান পরবর্তীকালে

আওয়ামী লীগ মন্ত্রী), ইদ্রিস লোহানী, ইউনুস লোহানী, মরহুম মোহাম্মদ শাহজাহান ও আব্দুস সোবহান, পাবনাতে আমিনুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলাউদ্দীন ও প্রসাদ রায়, চট্টগ্রামে মরহুম রুহুল আমীন নিজামী ও অধ্যাপক আহসাবউদ্দীন (বর্তমান চীনপন্থী মার্কসিষ্ট নেতা), কুমিল্লায় অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম (বেশ কিছুদিন ন্যাপ সমর্থক ও বর্তমানে জনদলীয় নেতা), ও মরহুম দেওয়ান মাহবুব আলী (একাত্তরে দিল্লীতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু), নারায়নগঞ্জে শামসুজ্জোহা, মোস্তাফা সারোয়ার ও মোহাম্মদ শফিক এবং আরও অনেকে মফস্বল এলাকায় বাংলাভাষার দাবীকে জনপ্রিয় করার জন্য নিরলসভাবে কাজ শুরু করেছেন।

১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ ঢাকার ফজলুল হক হলে পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য সর্বস্তরের ছাত্র প্রতিনিধিদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে সর্বজনাব মোহাম্মদ তোয়াহা, তাজউদ্দীন আহমদ, শহীদুল্লাহ্ কায়সার, কমরুদ্দীন আহমদ, কাজী গোলাম মাহবুব, সরদার ফজলুল করিম, আনোয়ারা খাতুন এবং অধ্যাপক আবুল কাশেম ছাড়াও শামসুল আলম, রনেশ দাসগুপ্ত, লিলি খান প্রমুখ যোগদান করেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ, ডেমোক্রেটিক লীগ, তমদ্দুন মজলিশ, প্রগতি লেখক সংঘ এবং আরো কয়েকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদান করেন। বৈঠকে প্রত্যেকটি হল, প্রতিষ্ঠান ও দল থেকে প্রতিনিধি মনোনীত করে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রথম 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। সলিমুল্লাহ্ হলের ছাত্র নেতা শামসুল আলম সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন। বৈঠকে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার দাবীতে ১১ই মার্চ (১৯৪৮) দেশব্যাপী ধর্মঘট পালন করা হবে। অচিরেই পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় ছাত্রদের উদ্যোগে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় এবং ছাত্র সমাজ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাংলাভাষার পক্ষে দ্রুত জনমত গঠন করতে সক্ষম হয়। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সর্ব বৃহৎ ছাত্র প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতার সাফল্য দেখে অনেকের দৃষ্টি সেদিন এই তরুণ যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ১১ই মার্চে ঢাকার ছাত্র-শোভাযাত্রার পুরোভাগে শেখ মুজিব নেতৃত্ব দান করেন।

এরকম এক বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম গভর্ণর জেনারেল এম এ জিন্নাহ্ পূর্ব বাংলা সফরে আগমন করেন। তিনি রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত জনসভায় (২১শে মার্চ) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ঘোষণা করলেন যে, 'কেবলমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। তিনি আরও বললেন, 'বাংলা ভাষা আন্দোলনের পশ্চাতে পঞ্চম বাহিনীর অস্তিত্ব রয়েছে'। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা রেসকোর্স ময়দান আর কার্জন হলে সংঘবদ্ধভাবে এর প্রতিবাদ করলো। ছাত্রদের এই জোরালো প্রতিবাদে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার স্তম্ভিত হলো।

এটা এমন একটা সময় ছিলো, যখন কোন সরকারী বক্তব্যের প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা সামান্য সমালোচনাও অপরাধ বলে গণ্য হতো। বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার, বহিষ্কার আর লাঠিচার্জ ছিলো নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। সম-সাময়িক কালের সংবাদপত্রের রিপোর্ট থেকে তখনকার অবস্থা এবং সরকারের মনোভাব সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা যাবে। ১৯৪৮ সালের ১৪ই মার্চ দৈনিক আজাদে প্রকাশিত একটা রিপোর্টের শিরোনাম হচ্ছে,

"বঙ্গভাষায় গাড়ীর নম্বর প্লেট ঃ
ড্রাইভারের ৫ টাকা জরিমানা।"

[নিবন্ধের বাকী অংশ ৯৭ পৃষ্ঠায়]

হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী'
সংকলনের (১৯৫৩) কয়েকটি সংগ্রামী কবিতার নমুনা

এবার আমরা তোমার

হাসান হাফিজুর রহমান

আম্মা তাঁর নামটি ধরে একবারও ডাকবে না তবে আর ?
ঘূর্ণিঝড়ের মতো সেই নাম উত্থাপিত মনের প্রান্তরে
ঘুরে ঘুরে জাগবে, ডাকবে,
দুটি ঠোঁটের ভেতর থেকে মুক্তোর মতো গড়িয়ে এসে
একবারও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না, সারাটি জীবনেও না ?
কি করে এই গুরুভার সইবে তুমি, কতোদিন ?
আবুল বরকত নেই; সেই অস্বাভাবিক বেড়ে ওঠা
বিশাল শরীর বালক, মধুর স্টলের ছাদ ছুঁয়ে হাঁটতো যে তাঁকে
ডেকো না;
আর একবারও ডাকলে ঘৃণায় তুমি কুঁচকে উঠবে—
সালাম, রফিকউদ্দীন, জব্বার—কি বিষন্ন থোকা থোকা নাম;
এই এক সারি নাম বর্শার তীক্ষ্ণ ফলার মতো এখন হৃদয়কে হানে;
বিচ্ছেদের জন্যে তৈরী হওয়ার আগেই
আমরা ওদেরকে হারিয়েছি—
কেননা, প্রতিক্রিয়ার গ্রাস জীবন ও মনুষ্যত্বকে সমীহ করে না;
ভেবে ওঠার আগেই আমরা ওদেরকে হারিয়েছি
কেননা, প্রতিক্রিয়ার কৌশল এক মৃত্যু দিয়ে হাজার মৃত্যুকে
ডেকে আনে।
আর এবার আমরা হারিয়েছি এমন কয়জনকে
যাঁরা কোনদিন মন থেকে মুছবে না,
কোনদিন কাকেও শান্ত হতে দেবে না;
যাঁদের হারালাম তাঁরা আমাদেরকে বিস্তৃত করে দিয়ে গেল
দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে, কণা কণা করে ছড়িয়ে দিয়ে গেল
দেশের প্রাণের দীপ্তির ভেতর মৃত্যু অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে।
আবুল বরকত, সালাম, রফিকউদ্দীন, জব্বার
কি আশ্চর্য, কি বিষন্ন নাম ! একসার জ্বলন্ত নাম ।।

॥২॥

কৃষাণ যেমন বর্ষার পলিসিক্ত মাঠে রোয়া ধানের চারাগুলো
রেখে আসে সোনালী শস্যের জন্মের আকাংখায়
তেমনি আমার সরু অনুভূতিগুলো জনতার গভীরে বুনে এসেছি;
দেশ আমার, ইতিহাসের ধারা যে জ্ঞান আমাকে দিয়েছে তারই
পবিত্র সন্তান একটি দিনে তোমার হৃদয়ের বিদীর্ণ আভাকে
দেখিয়েছ—বিদীর্ণ আভায় জ্বলেছিল;
যে আভারই আকস্মিক স্পর্শে হয়তো

কহিতুর চূর্ণ চূর্ণ হয়ে ছড়িয়েছিল প্রাণপ্রার্থী প্রান্তরে প্রান্তরে।
দেশ আমার তোমার প্রাণের গভীর জলে স্নান করে এবার এলাম
তোমার প্রাণের গভীর জলে স্নান করে এবার এলাম;
শ্রমিক তার শিল্পে প্রতিভার স্বাদ মেশাতে পেরে
যে তৃপ্তিতে বিশাল হয়ে ওঠে তারই স্পর্শের পরাগ
সারা চেতনায় মেখে একবার আকাশের দিকে তাকালাম,
একবার তোমার গ্রাম যমুনার ঘোলা স্রোতে দৃষ্টিকে ডুবিয়ে নিয়ে
লক্ষ লক্ষ চারা ধানের মতো আদিগন্ত প্রাণের সবুজ
শিখাগুলো দেখি,
কি আশ্চর্য দীপ্তিতে তোমার কোটি সন্তানের প্রবাহে প্রবাহে
সংক্রমিত হয়েছে—
একটি দিন আগেও তো বুঝতে পারি নি, দেশ আমার ।।
জন্মদাতা পিতার বাষ্পস্তব্ধ চোখ দুটোকে একবার মনে করো,
একটি মাত্র ভাইকে হারিয়ে বোনের অকস্মাৎ আর্তচিৎকারকে,
সময়ের নিভৃত মন্দিরে সংগোপনে এসে যারা পরস্পরে
হৃদয়ের সততার কথা বলে গেছে
তাদের একজন আজ নেই
যুগল পাখির একটি আজ নেই
করুণ আঁখি হরিণী তার কোমল শাবকটিকে হারিয়েছে,
সমুদ্রের আকুল ঢেউয়ের মতো সীমাক্রান্ত কান্না,
দিকে দিকে প্লাবিত কান্না, দৃষ্টিমান তার চক্ষুকে হারিয়েছে;
হে আমার জ্ঞান একটি মাত্র উচ্চারণের বিষ আমাকে দাও
বা হৃদয় থেকে হৃদয়ে ছড়ায়,
ওষধি জন্মের মতো একবার স্পন্দিত হয়ে হয়ে যে ঘৃণা আর
কখনো মৃত্যুকে জানে না, হে আমার জ্ঞান।

আয়ুর প্রথম হৃদয়মন্থিত শব্দ,
মনুষ্যত্বের প্রথম দীক্ষা যে উচ্চারণে
তারই সম্মানের জন্যে তাঁরা যুথবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল;
বুদ্ধ আর মোহাম্মদের দৃষ্টির মতো দীপ্তি
ফল্গুর মুখদেশের মতো উন্মথিত আবেগ,
আকাশের যে সাতটি তারা সমস্ত নীলিমার ভেতর চিহ্নিত হয়ে আছে
তাদেরই মতো অনন্য—
জীবনের শত্রু শয়তানেরা সেই পবিত্র দেহগুলো ছিনিয়ে
নিয়ে গেছে—
আর তাঁদের আত্মা এখন আমরা হৃদয়ে হৃদয়ে পোষণ করি ।।
তাঁদের একজন আজ নেই;
না, তারা পঞ্চাশ জন আজ নেই—
আর আমরা সেই অমর শহীদদের জন্যে,
তাঁদের প্রিয় মুখের ভাষা বাংলার জন্যে একচাপ পাথরের মতো
এক হয়ে গেছি,
হিমালয়ের মতো অভেদ্য বিশাল হয়ে গেছি ।।
হে আমার দেশ, বন্য মতো
সমস্ত অভিজ্ঞতার পলিমাটিকে গড়িয়ে এনে একটি চেতনাকে
উর্বর করেছি;

এখানে আমাদের মৃত্যু ও জীবনের সন্ধি,
সমুদ্র সৈকতে দুঃসাহসী নাবিকের করোটির ভেতর যেমন
দূরদিগন্তের হাওয়া হাহাকার করে
তেমনি এখানে রয়েছে একটি কোমল নারীর আশাহত সখিনা হৃদয়,
এখানে রয়েছে মা আর পিতা,
ভাই আর বোন, স্বজনবিধুর পরিজন
আর তুমি আমি, দেশ আমার !
এখানে আমরা ফ্যারাউনের আয়ুর শেষ কটি বছরের ঔদ্ধত্যের
মুখোমুখি,
এখানে আমরা পৃথিবীর শেষ দ্বৈরথে দাঁড়িয়ে,
দেশ আমার, স্তব্ধ অথবা কলকণ্ঠ এই দ্বন্দ্বের সীমান্তে এসে
মায়ের স্নেহের পক্ষে থেকে কোটি কণ্ঠ চৌচির করে দিয়েছিঃ
এবার আমরা তোমার ।।

।।৩।।

বস্তীবাসিনী মা অকস্মাৎ স্বাস্থ্যবান একটি সন্তানকে বুকের
কাছে ধরতে পারলে
যেমন করে আহত দিনের অসংখ্য মৃত্যুকে ভুলে থাকতে পারে
তেমনি পঞ্চাশটি শহীদ ভাইয়ের মৃত্যুকে ভুলেছি
মা, তোমাকে পেয়েছি বলে।
আজ তো জানতে এতটুকু বাকী নেই মাগো,
তুমি কি চাও, তুমি কি চাও, তুমি কি চাও ।।

কাল রাতে উঠেছিল ঝড়

আব্দুল গণি হাজারী

কাল রাতে উঠেছিল ঝড়।
আম-জাম নিমের-শাখায়
কাল রাতে এসেছিল
সত্যকার ঝড়।

ফাল্গুনের রৌদ্রতপ্ত তৃষিত মাটিতে—
সে ঝড় কাঁপন তুলেছিল,
দিয়েছিল
কাজল মেঘের হাত ছানি।
অবোধ গাছের যত পাগল পাতারা
ক্ষেপে উঠেছিল।
ভেবেছিল, এই ঝড়
আনবে আনবে এক অমৃত ক্ষরণ
আনবে আনবে এক অরুণ জীবন।।

আজ ভোরে উঠে দেখি
আকাশ গম্ভীর,
গাছের পাতারা সব
স্তব্ধ হয়ে আকাশের গায়
স্তব্ধ-চিত্র এঁকে দিয়ে মেলে মেলে আছে
বিদ্যুতের তারে তারে অখন্ড নিরাশা।।

তবে বুঝি আসেনি-ক ঝড়
তবে বুঝি এসেছিল শুধুই ইংগিত
কিংবা শুধু এসেছিল সংকেতের মায়া।।

"না—না—না"
আমার ঘরের কোণে বিমর্ষ দাদুরী
সে কহে "এসেছিল ঝড়।
দেখনা তোমার আঙিনায়
ভেঙেছে গাছের শাখা
পড়েছে অনেক কাঁচাপাতা ?
কাল শুধু অপমৃত্যু নিয়ে
এসেছিল ঝড়।
সে ঝড় আনেনি কোন প্রাণের বর্ষণ"।

বাতায়ন খুলে দেখি আমি,
আকাশের কোণে কোণে
এখনও লেগে আছে মেঘ।
আমার-ত মনে হয়
এই মেঘে আসবে বর্ষণ
এই মেঘে বুনে যাবে
অসংখ্য জীবন ॥

তোমরা নিশ্চিহ্ন করে দাও

শামসুর রাহমান

আর যেন না দেখি কার্তিকের চাঁদ কিংবা
পৃথিবীর কোনো হীরার সকাল,
কোনোদিন আর যেন আমার চোখের কিনারে
আকাশের প্রতিভা, সন্ধ্যানদীর অভিজ্ঞান আর
রাত্রি রহস্যের গাঢ় ভাষা কেঁপে না ওঠে,
কেঁপে না ওঠে পৃথিবীর দীপ্তিমান দিগন্তের তারা।
আগুনতাঁতা সাঁড়াশি দিয়ে তোমরা উপড়ে ফেলো আমার দুটি চোখ—
সেই দুটি চোখ, যাদের প্রাজ্ঞ দীপ্তির মৃত্যুহীন, বিদ্রোহী জ্বালায়
দেখেছি নির্মম আকাশের নিচে মানবিক মৃত্যুর তুহিন-স্তব্ধতা,
দেখেছি বাস্তুহারা কুমারীর চোখের বাষ্পকণার মতো কুয়াশা-ঢাকা দিন,
দেখেছি মোহাম্মদ, যীশু আর বুদ্ধের বিদীর্ণ হৃদয়, তাঁদের রক্ত
ঝরে ঝরে পড়ছে সাদা সাদা অসংখ্য অসংখ্য দাঁতের কুটিল হিংস্রতায়।

আর যেন না দেখি প্রিয়ার স্বপ্নজড়ানো নরম-সোনালি চুল,
কোনো শ্রাবণরাত্রির জানালায় রাখা তার মুখের গভীরতা,
আর যেন আমার চোখের কিনারে
কেঁপে না ওঠে পূর্ণিমার জোৎস্নার ঢেউ, আমার দেশের নীরক্ত শরীর।।

তারপরো আমার আত্মার স্বর বীক্ষণের প্রতিভা ছড়াবে অমাবস্যা-নিমগ্ন
প্রাণের শিকড়ে শিকড়ে,
প্রমেথেউসের গানের মতো আমার গলার রৌদ্রোজ্জ্বল চীৎকার
কাঁপিয়ে দেবে এই পৃথিবীর আকাশ বাতাস,
ফেটে চোচির হয়ে যাবে মিশরীয় স্ফিংক্সের স্থবিরতা,
খসে যাবে তোমাদের রাত্রির দীপ্তিমান তারা, দিনের সূর্য।।

টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলো আমার সূর্যের মত হৃৎপিন্ড,
যেমন কোনো পেশওয়ারী ফলওয়ালা তার ধারালো ছুরির হিংস্রতায়
ফালি ফালি করে কেটে ফেলে তাজা, লাল টকটকে একটি আপেল।
কিন্তু শোনো, এক ফোঁটা রক্তও যেন পড়ে না মাটিতে,
কেননা আমার রক্তের কণায় কণায় উজ্জ্বল স্রোতের মতো
বয়ে চলেছে মনসুরের বিদ্রোহী রক্তের অভিজ্ঞান।
তোমরা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলো আমার হৃৎপিন্ড—
যে হৃৎপিন্ডে ঘন ঘন স্পন্দিত হচ্ছে আমার দেশের গাঢ় ভালোবাসা,
যে হৃদয়—
মা'র পবিত্র আশীর্বাদ মতো
বোনের স্নিগ্ধ, প্রশান্ত দৃষ্টির মতো,
প্রিয়ার হৃদয়ের শব্দহীন গানের মতো
শান্তির জোৎস্না চেয়েছিল পৃথিবীর আকাশের নিচে,
চৈত্রের তীব্রতায়, শ্রাবণের পূর্ণিমায়॥

দোহাই চেঙ্গিসের উলঙ্গ তরবারির হিংস্রতার,
দোহাই ফ্যারাওয়ের ম্যামিগন্ধি বীভৎসতার,
দোহাই তৈমুরের পৈশাচিক রক্ত-নেশার,
তোমরা নিশ্চিহ্ন করে দাও আমার অস্তিত্ব,
পৃথিবী হতে চিরদিনের জন্যে নিশ্চিহ্ন করে দাও
উত্তরাকাশের তারার মতো আমার ভাস্কর অস্তিত্ব,
নিশ্চিহ্ন করে দাও, নিশ্চিহ্ন করে দাও

মাগো ওরা বলে

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্

"কুমড়ো ফুলে ফুলে
নুয়ে পড়েছে লতাটা,
সজ্‌নে ডাঁটায়
ভরে গেছে গাছটা,
আর, আমি ডালের বড়ি
শুকিয়ে রেখেছি—
খোকা তুই কবে আসবি।
কবে ছুটি ?"
চিঠিটা তার পকেটে ছিল,
ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা।

"মাগো, ওরা বলে,
সবার কথা কেড়ে নেবে
তোমার কোলে শুয়ে
গল্প শুন্‌তে দেবে না।
বলো, মা, তাই কি হয় ?
তাইতো আমার দেরী হচ্ছে।
তোমার জন্যে কথার ঝুড়ি নিয়ে
তবেই না বাড়ী ফিরবো।

লক্ষী মা রাগ ক'রোনা,
মাত্রাতো আর কটা দিন।"

"পাগল ছেলে"
মা পড়ে আর হাসে,
"তোর ওপরে রাগ করতে পারি!"
নারকেলের চিড়ে কোটে,
উড়কি ধানের মুড়কি ভাজে
এটা সেটা আরো কত কি!
তার খোকা যে বাড়ী ফিরবে!
ক্লান্ত খোকা!

কুমড়ো ফুল
শুকিয়ে গেছে,
ঝ'রে প'ড়েছে ডাঁটা;
পুঁইলতাটা নেতানো,—
"খোকা এলি?"—
ঝাপসা চোখে মা তাকায়
উঠোনে, উঠোনে
যেখানে খোকার শব
শকুনিরা ব্যবচ্ছেদ করে।

এখন,
মা'র চোখে চৈত্রের রোদ
পুড়িয়ে দেয় শকুনিদের।
তারপর,
দাওয়ায় ব'সে
মা আবার ধান ভানে,
বিন্নি ধানের খই ভাজে,
খোকা তার
কখন আসে! কখন আসে!
এখন,
মার চোখে শিশির ভোর,
স্নেহের রোদে
ভিটে ভরেছে!

স্মৃতির মিনার

আলাউদ্দিন আল আজাদ

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার ? ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো
চারকোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি তো। যে-ভিৎ কখনো কোন রাজন্য
পারেনি ভাঙতে
হীরার মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার
খুরের ঝটিকা ধূলায় চূর্ণ যে-পদপ্রান্তে
যারা বুনি ধান
গুণ টানি, আর তুলি হাতিয়ার হাপর চালাই
সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্য।
ইটের মিনার
ভেঙেছে ভাঙ্গুক। ভয় কি বন্ধু, দেখ একবার আমরা জাগরী
চারকোটি পরিবার ॥

এ-কোন্ মৃত্যু ? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,
শিয়রে যাহার ওঠেনা কান্না, ঝরেনা আশ্রু ?
হিমালয় থেকে সাগর অবধি সহসা বরং
সকল বেদনা হয়ে ওঠে এক পতাকার রং
এ-কোন মৃত্যু ? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,

বিরহে যেখানে নেই হাহাকার ? কেবল সেতার
হয় প্রপাতের মহনীয় ধারা, অনেক কথার
পদাতিক ঋতু কলমেরে দেয় কবিতার কাল ?

ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙ্গুক। একটি মিনার গড়েছি আমরা
চারকোটি কারিগর
বেহালার সুরে, রাঙা হৃদয়ের বর্ণলেখায়।
পলাশের আর
রামধনুকের গভীর চোখের তারায় তারায়
দ্বীপ হয়ে ভাসে যাদের জীবন, যুগে যুগে সেই
শহীদের নাম
এঁকেছি প্রেমের ফেনি, শিলায়, তোমাদের নামে।
তাই আমাদের
হাজার মুঠির বজ্র শিখরে সূর্য্যের মতো জ্বলে শুধু এক
শপথের ভাস্কর ॥

ধানের গুচ্ছে রক্ত জমেছে

ফজলে লোহানী

শীতল পৃথিবী, অবশ নগর,
অসার আকাশ, বাতাস নিথর,
ফুটপাতে শুধু ছড়িয়ে আছে জীবনের সব রেনুকণা যত।
রোদগুলো সব ছড়িয়ে পড়েছে, বিছিয়ে রয়েছে ঘাসের মতন,
পলাশফুলের ডগায় ডগায়, ল্যাম্পপোষ্টের উঁচু কোনটায়।
একুশে বিকেল।
মৃত্যু হয়েছে আজকে ওদের।
বোবা পাখাগুলো পাখা ঝাপ্‌টায়।
একুশে রাতের আঁধার নামে সব শহরের গলিঘুঁজিতে,
গাঁয়ের বাঁকা পথগুলোতে,
রেল কলোনীতে, কেরাণীর ঘরে, কিষাণের ঘরে।
ঘরে নয় শুধু। সবার বুকে
আঁধার নেমেছে।
আজকে তাদের মৃত্যু হয়েছে তাই শুনে
সব স্তব্ধ পাষাণ।
সব চুপচাপ।
পাখিগুলো শুধু পাখা ঝাপ্‌টায়। ব্যথায় বোধহয়।
সবাই শুধোয়। শিলাময়
মন কথা কয়ে ওঠে ঃ
ওদের কি আজ মৃত্যু হয়েছ ?
হাসপাতালের গন্ধবাতাস।
বাইরে প্রহরী। খবর কোথায় ?
সবাই শুধোয় রাস্তার দল, অফিসের লোক,
দোকানী, পসারী, ও পাহাড় মুদী,
নৌকোর মাঝি হাল ছেড়েছে,
কামারের ঘরে হাপর থেমেছে,
কাস্তে থেমেছে, কোদাল থেমেছে,
রেলইঞ্জিনে সিটি থেমে গেছে।

ঘুমভাঙ্গা কোন কবরখানায় জলার ধারে
প্রহরী কুকুর ডেকে ডেকে কয়
ঃ শহরে কি আজ মিছিল ছিল ?
ফাল্গুী রাত আঁধারে কাঁদে। একা ল্যাম্পপোষ্ট মিটিমিটি জ্বলে।

শহরে সেদিন মিছিল ছিল।
পৃথিবী সেদিন উল্টো ঘোরেনি, এগিয়ে গেছে।
সবাই শুন্‌লো ঃ খুন হয়ে গেছে, খুন হয়ে গেলো।
মায়ের চোখের দু'ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়েছে রমনার পথে।
ধানের গুচ্ছে রক্ত জমেছে, সমুদ্র তাই উদ্বেল হল।
ইস্পাত-দৃঢ় কঠিন শপথ।

কাজ নয় আর কাজ নয়।
ফেরারী বসন্ত কয়ে দিয়ে গেল নগরীতে যত
শিবিরে শিবিরে ঃ
কাল শহরে মিছিল ছিল।
কাজ নয় আজ কাজ নয়।
সকালের রোদে খবর পেয়েছে
বাংলার ঘরে সব ভাইবোন
ঃ হত্যা হয়েছে কাল শহরে।
তাই কাজ নয় আর কাজ নয়।
মৃত্যুকে যারা ভয় করেনি,
মৃত্যু তাদের বরণ করেছে,
এ খবর গিয়ে গাঁয়ে পৌঁছেছে
সবার মুখেই বজ্র শপথ
ঃ হাতুড়ী আমরা নামিয়ে নিলাম
কাস্তে-কোদাল থামিয়ে দিলাম
কাঁচা-শহীদের স্মৃতির ভারে।
পাড়ার মোড়ে ল্যাম্পপোষ্টটাও অবনমিত
শ্রদ্ধাভরে।

বাংলার কোন দূরদেশ গাঁয়ে।
সজনে তলায় মাটির ঘরে উঁচু দাওয়াটায়
প্রদীপ জ্বলে
জীবনের সব ভীরু পাখাগুলো জড়ো হয়ে আছে মায়ের মনে।

একাকী মায়ের ফাঁকা বুকখানি কেঁপে কেঁপে ওঠে কিসের শোকে ?
'মাগো, ভাবনা কিসের ? আস্‌ছে ছুটিতে আবার
ফিরবো তোমার কোলেই।'

শহীদ ছেলের শেষ কথাগুলো মনে পড়ে যায়
একলা রাতে।
দুঃখিনী মায়ের আঁচলের ধন ফিরে আসবেই
রাত্রিশেষে। ছুটির শেষে।
আকাশের যত তারারা আজ্‌কে ভীড় করে সব
মিছিল করেছে।
সখিনা মায়ের অশ্রু ছুঁয়ে শপথ নিয়েছে।

আর চুপ নয়,
মায়েরা সব গেয়ে ওঠো আজ।
ধান ভান্‌তে ক্ষুদ্‌ কুড়োতে,
গমের শীষের খোসা ছাড়াতে
মায়েরা সব গেয়ে ওঠো—
আর চুপ নয়, এবার শুধু
শহীদের গান। বিজয়ের গান॥
শহরে যাদের মৃত্যু হয়েছে,
ফিরে আস্‌ছে, ফিরে আস্‌ছে,
হাজারে হাজারে মিছিল করে॥

[অনেকের মতে কবির সাম্প্রতিক চিন্তাধারা বিতর্কিত। কিন্তু ৩৩ বছর আগে কবির রচিত এই কবিতার ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' পুস্তক থেকে এই কবিতা সংকলিত।—সম্পাদকবৃন্দ]

১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে করাচীর অদুরে জিয়ারতে 'রহস্যজনকভাবে' এম এ জিন্নাহ্‌র মৃত্যু হলে খাজা নাজিমউদ্দীন পাকিস্তানের পরবর্তী গভর্ণর জেনারেল মনোনীত হন এবং পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন নুরুল আমিন। এদিকে রাজশাহী ও দিনাজপুরের ছাত্র আন্দোলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ধর্মঘট ও ছাত্র বহিষ্কার, দিনাজপুর জেলে রাজবন্দীদের উপর লাঠিচার্জ, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দীদের দীর্ঘস্থায়ী অনশন ধর্মঘট, রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে নিরস্ত্র রাজবন্দীদের গুলি করে হত্যা, নাচোলে রক্তাক্ত কৃষক আন্দোলন, আরবী হরফে বাংলা ভাষা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা এবং ডঃ আব্দুল হক ও ডঃ সাদানী প্রমুখ কর্তৃক উর্দুর পক্ষে নির্লজ্জ ওকালতি সমগ্র প্রদেশের পরিবেশকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে।

১৯৪৯ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর করাচীতে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঘোষণা করলেন যে, "একমাত্র উর্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হইবে।" মাত্র এক মাসের ব্যবধানে লিয়াকত আলী পূর্ব বাংলা সফরে আগমন করে ময়মনসিংহের এক জনসভায় বললেন, "শত্রুপক্ষীয় চরদের রাষ্ট্রবিরোধী আচরণের বিরুদ্ধে আমি কঠোর সর্তকবাণী উচ্চারণ করিতেছি।" পূর্ব বাংলায় সরকার বিরোধী আওয়ামী লীগ গঠন হওয়ায় সেদিন এই ছিলো প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের প্রতিক্রিয়া।

১৯৪৯ সালের ২৩শে ও ২৪শে জুন তারিখে ঢাকার রোজ গার্ডেনে সরকার বিরোধী মনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং পরে নারায়নগঞ্জের 'বায়তুল আমান' (মরহুম ওসমান দালালের বাসভবন) থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্টি গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়। ৪০ জন সদস্য সমবায়ে গঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রাক্তন সভাপতি ও সিলেট 'রেফারেনডাম'-এর বিজয়ী নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। মওলানা সাহেব দলের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে মনোনীত করলেন যুব নেতা শামসুল হককে। জনাব হক পাকিস্তান অর্জিত হবার পর টাংগাইলের প্রথম উপ-নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন ডেমোক্রেটিক লীগের সাধারণ সম্পাদক। নব গঠিত আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে মনোনীত হলেন দাউদকান্দির খন্দকার মোশতাক আহমদ ও গোপালগঞ্জের শেখ মুজিবুর রহমান।

এটা এমন সময় ছিলো, যখন পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ সরকার এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলো। তখন রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তীর উদ্যোক্তাদের পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, বরিশালে ম্যাক্‌সিম গোর্কীর 'মা' পুস্তক (বাংলা অনুবাদ) বিক্রয়ের 'অপরাধ' জনৈক পুস্তক বিক্রেতাকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতারবরণ করতে হয়েছে। এ সময়ে ভাসানী-সোহ্‌রাওয়ার্দীর জনসভাগুলো হয় গুণ্ডা বাহিনীর হামলায় নষ্ট করা হয়েছে, না হয় ১৪৪ ধারা জারী করে সভা বন্ধ করা হয়েছে। এমন কি জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীকে জননিরাপত্তা আইনে বহিষ্কার পর্যন্ত করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী থাকায় ১৯৫১ সালের ২৭শে ও ২৮শে মার্চ তারিখে বুড়িগংগার নদী বক্ষে ভাসমান নৌকায় গঠিত হয় অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের। পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনে যুব লীগের অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এর পাশাপাশি পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুক্তবুদ্ধি চিন্তাধারার ব্যাপক উন্মেষের সূচনা হয়।

এই প্রেক্ষাপটে পূর্ব বাংলার অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গতি রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে কলকাতার দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ক্ষমতাসীন দলের চক্রান্তে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা ও বরিশালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। উপরন্তু আরবী হরফে বাংলা প্রবর্তনের সরকারী প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। ১৯৫১ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান রাওয়ালপিন্ডির এক প্রকাশ্য জনসভায় আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে খাজা নাজিমউদ্দীন প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হন এবং যথারীতি উর্দু ভাষার পক্ষে ওকালতি শুরু করেন।

দ্বিতীয় ভাষা আন্দোলন— ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী ঢাকার পল্টন ময়দানে মুসলিম লীগের আয়োজিত জনসভায় পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ভাষণদানকালে ঘোষণা করলেন যে, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।" ফলে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে এর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো।

এর পরবর্তী ঘটনাবলী সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

৩০শে জানুয়ারী— ১৯৫২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার সমর্থনে ছাত্র ধর্মঘট, প্রতিবাদ সভা এবং রমনা এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল।

বিকালে আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ঢাকা বার লাইব্রেরীতে দলীয় কর্মীসভা এবং ১৬ সদস্য বিশিষ্ট সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ (আহবায়ক ঃ কাজী গোলাম মাহবুব) গঠন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রদেশব্যাপী হরতাল ও বিক্ষোভের কর্মসূচী ঘোষণা। এইদিন বিকাল তিনটায় প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশন শুরু হবে বলে নির্ধারিত ছিলো।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রাম পরিষদের (আহ্বায়ক ঃ আবদুল মতিন বি কম) আহ্বানে বাংলা ভাষার দাবীতে রাজধানী ঢাকা নগরীতে ছাত্র ধর্মঘট। গাজীউল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে ছাত্র-সভা ও বিক্ষোভ মিছিল এবং একুশের হরতাল সফল করার আহ্বান। ৫ই ফেব্রুয়ারী দৈনিক আজাদ পত্রিকায় এতদসম্পর্কিত প্রকাশিত সংবাদের শিরোনাম ছিলো, "রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ঢাকায় ছাত্র বিক্ষোভ ঃ সোমবার পূর্ণ ধর্মঘট পালিত ঃ শোভাযাত্রা সহকারে দশ সহস্র ছাত্র-ছাত্রীর শহর প্রদক্ষিণ"। এই দিবসকে সাফল্যের সংগে পালনের মূল কৃতিত্বে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ (পরবর্তীকালে বিলুপ্ত) ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের একাংশের।

৫ই—১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

সমগ্র প্রদেশব্যাপী একুশে ফেব্রুয়ারী বাংলার দাবীতে রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি।

২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে আন্দোলনকারীদের সংগে একাত্মতা ঘোষণার জন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অপর কয়েকজন রাজবন্দীর সংগে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুরের অনশন ধর্মঘট শুরু।

নুরুল আমিন সরকার কর্তৃক ঢাকায় আকস্মিকভাবে ১৪৪ ধারা জারী এবং পরবর্তী এক মাসের জন্য সভা-শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা।

সন্ধ্যায় নবাবপুরের আওয়ামী লীগ অফিসে পরিস্থিতির মোকাবেলায় খেলাফতে রব্বানী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা জনাব আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের জরুরী বৈঠক।

১১-৪ ভোটে ১৪৪ ধারা না ভাংগার প্রস্তাব পাশ এবং রাতে ঘোড়ার গাড়ীতে মাইক লাগিয়ে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত ব্যাপক প্রচার। জরুরী বৈঠকে ১৪৪ ধারা ভংগের পক্ষে বক্তৃতা করেও মোহাম্মদ তোয়াহা ভোটদানে বিরত। আইন ও শৃংখলাজনিত পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে, একে বাহানা করে মুসলিম লীগ সরকার আসন্ন সাধারণ নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করতে পারে আশংকায় তৎকালীন কম্যুনিষ্ট পার্টির গোপন সিদ্ধান্ত হচ্ছে, 'বৃহত্তর স্বার্থে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা বাঞ্ছনীয় হবে না।"

গভীর রাতে ফজলুল হক হলের পুকুর পাড়ে ১১ জন প্রগতিশীল ছাত্র নেতার গোপন বৈঠক এবং পরদিন একুশে ফেব্রুয়ারী যে কোনও পরিস্থিতিতে ১৪৪ ধারা ভংগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত ছাত্র সভায় যাতে করে ১৪৪ ধারা ভংগের প্রস্তাব গৃহীত হয়, সেজন্য এই বৈঠকে কৌশল নির্দ্ধারিত হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হচ্ছে প্রস্তাবিত ছাত্র সভায় গাজিউল হককে সভাপতি করতে হবে। প্রস্তাবক হবেন এম আর আখতার মুকুল এবং প্রস্তাবের সমর্থন করবেন কমরুদ্দীন শহুদ। এই বৈঠকে যে ১১জন ছাত্র নেতা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ ১ হাবিবুর রহমান শেলী (বর্তমানে বিচারপতি) ২ জিল্লুর রহমান (পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক) ৩ মোহাম্মদ সুলতান (পরবর্তীকালে ন্যাপ ভাসানীর অস্থায়ী সাধারন সম্পাদক ও মরহুম) ৪ মনজুর হোসেন (মরহুম ডাক্তার) ৫ আব্দুল মোমিন (আওয়ামী লীগের প্রাক্তন মণ্তরী) ৬ এস এ বারী এটি (পরবর্তীকালে বিএনপির প্রাক্তন উপ-প্রধান মণ্তরী) ৭ গাজীউল হক (বর্তমানে বিশিষ্ট এ্যাডভোকেট) ৮ এম আর আখতার মুকুল (একাত্তরে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের 'চরম পত্র' অনুষ্ঠানের লেখক ও কথক) ৯ কমরুদ্দিন শহুদ (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক) ১০ আনোয়ারুল হক খান (পরবর্তীকালে মুজিবনগর সরকারের তথ্য সচিব) এবং ১১ আনোয়ার হোসেন পরিচয় অজ্ঞাত।

২১শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার, ১৯৫২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের চত্বরে (বর্তমানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ইমার্জেন্সী এলাকা) পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক এম আর মুকুলের প্রস্তাব ও কমরুদ্দীন শহুদের সমর্থনে গাজিউল হকের সভাপতিত্বে (সভাপতি-টেবিলে দাঁড়িয়ে) বেলা ১১ টায় ছাত্রদের ঐতিহাসিক সভার শুরু। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশে সভায় পরিষদের পক্ষ থেকে তৎকালীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের (১৪৪ ধারা ভংগ না করা) কথা জানিয়ে দেন। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে তিনি আন্দোলনের স্বপক্ষে ছিলেন। সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক আব্দুল মতিন (বর্তমানে চীনপন্থী মার্ক্সিষ্ট নেতা) এবং সভাপতি গাজিউল হক উভয়েই ১৪৪ ধারা ভংগের পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। ফলে গগনবিদারী 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগানের মধ্যে ১৪৪ ধারা ভংগের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এসময় আব্দুস সামাদের (পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী) প্রস্তাব মতো ১৪৪ ধারা ভংগ করে দফায় দফায় রাজপথে 'দশজনী' ছাত্রের মিছিল ও গ্রেফতার বরণ। কলাভবন এলাকায় পুলিশ কর্তৃক

অবিরাম কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার ও উপর্যুপুরি লাঠি চার্জ। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের পাল্টা ইষ্টক বৃষ্টি। এসময় ঢাকার রমনা এলাকা ছাড়া রাজধানীর সর্বত্রই মোটামুটি স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত।

বেলা তিনটায় প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশন শুরু হবে বলে দুই ঘটিকা থেকে মেডিক্যাল কলেজের ব্যারাক হোষ্টেলের হাজার হাজার ছাত্রদের আবার জমায়েত। পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে কয়েক দফায় সংঘর্ষ। পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার এবং ছাত্রদের ইষ্টক বৃষ্টির ফলে মেডিক্যাল হোষ্টেল থেকে পরিষদ ভবন (বর্তমান জগন্নাথ হল) পর্যন্ত রাস্তায় যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ। পরিস্থিতির মোকাবেলায় আরও সশস্ত্র পুলিশের আমদানী। উদ্দেশ্য ছিলো মন্ত্রী ও পরিষদ সদস্যদের যাতায়াতের নিরাপত্তা বিধান করা।

কিন্তু পুলিশ ও ছাত্রদের অবিরাম সংঘর্ষে পরিস্থিতির আরও অবনতি হলো। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী রোজ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক তিনটা দশ মিনিটের সময় হঠাৎ করে একদল সশস্ত্র পুলিশ মেডিক্যাল কলেজের ব্যারাক হোষ্টেলের (আজকের দিনে যেখানটায় মেডিক্যাল হাসপাতালের আউটডোর) গেটের মধ্যে প্রবেশ করে গুলি বর্ষণ করলো। ঘটনাস্থলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের দু'জন ছাত্র আব্দুল জব্বার ও রফিকউদ্দীন নিহত হলো। হাসপাতালে বুলেটবিদ্ধ আহতের সংখ্যা ৯৬ জন। সন্ধ্যায় হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর একজন গুরুতরভাবে আহত ছাত্র আবুল বরকত ও বাদামতলীর এক প্রেসের কর্মচারী আব্দুল সালামের মৃত্যু হলো।

গুলি বর্ষণে ছাত্রহত্যার কথা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লে বেলা সাড়ে তিন ঘটিকা থেকে ঢাকায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালিত হলো। চারদিকে বিষাদের করুণ ছায়া। অন্যদিকে গুলিবর্ষণের স্থান থেকে মাত্র এক ফার্লং দূরে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদে তখন বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে। গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে অধিবেশন মুলতবী ঘোষণার জন্য বিরোধী দলীয় সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো।

এ সময় পাবনার মুসলিম লীগ দলীয় পরিষদ সদস্য মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগিশ চীৎকার করে স্পীকারকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, "যখন আমাদের বক্ষের মানিক, আমাদের রাষ্ট্রে ভাবী নেতা ৬ জন ছাত্র রক্ত শয্যায় শায়িত, তখন আমরা পাখার নীচে বসে হাওয়া খাব -- এ আমি বরদাশ্‌ত করতে পারিনা। আমি জালেমের এই জুলুমের প্রতিবাদে পরিষদ গৃহ পরিত্যাগ করছি এবং মানবতার দোহাই দিয়া আপনার মাধ্যমে সকল মেম্বারের কাছে পরিষদ গৃহ ত্যাগের আবেদন জানাচ্ছি।" এরপর মওলানা তর্কবাগিশ ও বিরোধী দলীয় সস্যদের পরিষদ কক্ষ ত্যাগ।

একুশে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় ঢাকা শহরে কারফিউ জারী করা হলো। প্রতিটি মহল্লায় সশস্ত্র পুলিশের টহল শুরু। রাতে আরও ৬২ জন ছাত্রকে গ্রেফতার এবং সেনা বাহিনী কর্তৃক ছাত্রদের লাশ উদ্ধারের জন্য মেডিক্যাল কলেজের মর্গে হামলা। অন্যদিকে আন্দোলনের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দানের উদ্দেশ্যে রাতেই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ পুনর্গঠিত। পরিষদের নতুন কর্মসূচী ঘোষণা। ২২শে ফেব্রুয়ারী পূর্ণ দিবস হরতাল এবং সকালে মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেল প্রাংগনে গায়েবানা জানাজা।

সন্ধ্যায় দৈনিক আজাদ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ। শিরোনাম ছিলো, "ঢাকার রাজপথ ছাত্রদের তাজা খুনে রঞ্জিত।" নুরুল আমিন সরকার এই বিশেষ সংখ্যা বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে।

২২শে ফেব্রুয়ারী (শুক্রবার) ঃ ১৯৫২

সকাল থেকেই রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে সেনাবাহিনীর টহল দান। সকাল ১০টায় মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাংগনে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ইমামতিতে লক্ষাধিক লোকের গায়েবানা জানাজা। ঢাকা হাইকোর্টের তৎকালীন এ্যাডভোকেট জেনারেল শেরে বাংলা ফজলুল হক সহ জনা কয়েক পরিষদ সদস্যের জানাজায় যোগদান।

শহীদদের লাশের অভাবে রক্তমাখা জামা-কাপড় লাঠির মাথায় নিয়ে ১৪৪ ধারা ভংগ করে ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা। কার্জন হলের কাছে মিছিলের মাঝ বরাবর সশস্ত্র বাহিনীর হামলা। ঘটনাস্থলে একজন নিহত এবং বহুসংখ্যক আহত। তবুও দুইটি বিরাট শোভাযাত্রার শহর প্রদক্ষিণ। নবাবপুর রোডে গুলিবর্ষণে হাইকোর্টের কর্মচারী শফিকুর রহমানের মৃত্যু। এই দিন বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার হামলায় উর্দু-সমর্থক ইংরেজী দৈনিক মর্ণিং নিউজ পত্রিকার জুবিলী প্রেস সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত।

২২শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলী সম্পর্কে পরদিন মুসলিম লীগ সমর্থক দৈনিক আজাদের সংবাদ শিরোনাম ছিলো নিম্নরূপ ঃ

পুলিশ ও সৈন্যদের গুলিতে ৪ জন নিহত ও শতাধিক ব্যক্তি আহত ঃ ৭ ঘন্টার জন্য কারফিউ জারী

শুক্রবার শহরের অবস্থার আরও অবনতি ঃ সরকার কর্তৃক সামরিক বাহিনী তলব

শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে শহরে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালন

বাইশে ফেব্রুয়ারী মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেল প্রাংগনে গুলিবর্ষণের স্থানে রাতারাতি প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণ। মূল নক্শার প্রণেতা তৎকালীন মেধাবী মেডিক্যাল ছাত্র বদরুল আলম (পরবর্তীকালে শিশু বিশেষজ্ঞ ও মরহুম)। ২৬শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় একদল সশস্ত্র পুলিশ এই শহীদ মিনার ধ্বংস করে দেয়।

একুশে ফেব্রুয়ারী বিকাল থেকে শুরু করে পঁচিশে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সলিমুল্লাহ্ হল থেকে মাইকযোগ যেসব 'অর্ডার অব দি ডে' ঘোষণা করা হয়, ঢাকাবাসী তা' অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। এ সময় সরকারী প্রশাসন প্রায় অচল ছিলো। দিন কয়েক পর্যন্ত প্রাদেশিক সচিবালয়ের প্রধান ফটকের তালা খোলার লোকও অনুপস্থিত ছিলো।

২৪শে ফেব্রুয়ারী ঃ ১৯৫২

ঢাকা শহরে দিনে হরতাল ও রাতে কারফিউ। প্রাদেশিক পরিষদ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা।

২৫শে ফেব্রুয়ারী ঃ ২৯৫২

প্রতিবাদ দিবস হিসাবে সর্বাত্মক হরতাল। কেবলমাত্র সকালে দু'ঘন্টার জন্য কাঁচা বাজার খোলা রাখার ব্যবস্থা। সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা।

২৬শে ফেব্রুয়ারী ঃ ১৯৫২

প্রায় ২৪ ঘন্টা সেনাবাহিনী কর্তৃক ঘেরাও করে রাখার পর এদিন সলিমুল্লাহ হলে দরজা ভেংগে সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর হলের অভ্যন্তরে প্রবেশ ও ব্যাপক তল্লাশী এবং বহু ছাত্র

গ্রেফতার। এ ছাড়া পুলিশ এইদিন নিরাপত্তা আইনে মওলানা তর্কবাগিশ, আবুল হাশিম, খয়রাত হোসেন, গোবিন্দলাল মুখার্জ্জি, অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক অজিত গুহ, অধ্যাপক পুলিন দে প্রমুখকে গ্রেফতার করে।

২৭শে ফেব্রুয়ারী ঃ ১৯৫২

ফজলুল হক হল এলাকা থেকে পুলিশ এইদিন বামপন্থী নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা, তৎকালীন যুব লীগ নেতা অলি আহাদ সহ বেশ কয়েকজন ছাত্র নেতাকে গ্রেফতার করে।

এরপর সরকারের প্রচন্ড দমননীতির মুখেও ভাষা আন্দোলন অব্যাহত থাকলো। সমগ্র প্রদেশব্যাপী হাজার হাজার ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের গ্রেফতারের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনকারীদের 'দেশদ্রোহী' আখ্যায়িত করে ৫ইমার্চ নাগাদ এই আন্দোলনকে সাময়িকভাবে দমন করা সম্ভব হলেও এর সাফল্য কেউই অস্বীকার করতে পারলো না। চুয়ান্ন সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হলো এবং ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হলো।

আজ থেকে প্রায় ৩৩ বছর আগে এটাই হচ্ছে সংক্ষেপে ভাষা আন্দোলনের গোড়ার কথা।

উপসংহার ঃ সত্যিকারভাবে বলতে গেলে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন সংগঠনের জন্য পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের একাংশ সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলো। বেশ কিছুসংখ্যক প্রগতিশীল সংগঠনও এই আন্দোলনের প্রতি সক্রিয় সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণ করেছিলো। উপরন্তু বাহান্নোর ভাষা আন্দোলনকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য বিপুল সংখ্যক নির্দলীয় ছাত্র-ছাত্রী এতে অংশ গ্রহণ করেছিলো। তাই এ কথা বলা চলে যে, জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভাষা আন্দোলন ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছিলো। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার রূপ ছিলো অত্যন্ত ব্যাপক। তা নাহলে ১৯৫০ সালে যে ঢাকা নগরী সাম্প্রদায়িক দাংগায় কলুষিত হয়েছিলো, সেই ঢাকা নগরীতেই মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে কেমন করে সংগঠিত হলো ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের ? এটাই তো' হচ্ছে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সোপান।

ভাষা আন্দোলনের শুরুটা হয়েছিলো জ্ঞান-তাপস ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র লেখনী দিয়ে। এরপর বিরোধী দলীয় সমস্ত মহল এবং বুদ্ধিজীবীরা এই আন্দোলনে সমর্থন জুগিয়েছিলো। কিন্তু ভাষা আন্দোলনে যেসব নাম না-জানা আর নির্দলীয় অথচ মুক্ত বুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্র শুধুমাত্র মাতৃ ভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম সেদিন জীবনকে তুচ্ছ করে এগিয়ে এসেছিলো এবং ইতিহাসের যুগ-সন্ধিক্ষণে নিজেদের বলিষ্ঠ ও সময়োপযোগী অবদান রেখে গেছেন, তাঁদের কৃতিত্ব সব চেয়ে বেশী।

বাহান্নোর ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে এর পরবর্তী অধ্যায়ে শুরু হলো বাংগালী সংস্কৃতির উন্মেষের আন্দোলন। এরপর স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধিকারের আন্দোলন এবং চরম পর্যায়ে একাত্তরের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। সবই একসূত্রে গাঁথা। কিন্তু সর্বত্রই মূল নেতৃত্ব জাতীয়তাবাদীদের । আর পিছনে সম্পূরক শক্তি হিসাবে বামপন্থীদের সমর্থক। বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিধারায় আজও পর্যন্ত এই স্তর অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। পঁচাত্তরের ১৫ই আগষ্ট থেকে শুরু করে বিরাশির সমাপ্তি পর্যন্ত নানা ঘটনা প্রবাহে জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বামপন্থী ও দক্ষিণ পন্থীদের মেরুকরণের অশুভ প্রচেষ্টার জের হিসাবে উল্লেখিত স্তর অতিক্রমের প্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছে বলে মনে হয়।

ক্ষোভ, আবেগ, বুদ্ধি ও যুক্তির একীভূত সমাবেশে দুর্বার হল সেই আন্দোলন

বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান শেলী

ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাংলা একাডেমী উনত্রিশটি প্রশ্নের একটি প্রশ্নমালা আমাকে দেখিয়েছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাবহেতু সব ক'টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তৎকালীন রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ সম্পর্ক না থাকায় রাজনৈতিক দলগুলির ভিতরের খবর আমি দিতে পারছি না। এ ছাড়া, তেত্রিশ বছর পরে স্বাভাবিক কারণে সেদিনের অনেক খুঁটিনাটি ঘটনা আমি স্মরন করতে পারছি না। এক একটি প্রশ্ন ধরে উত্তর না দিয়ে স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে মোটামুটি একটা বক্তব্য রাখার চেষ্টা করছি।

আমার জন্ম এক রাজনৈতিক পরিবারে। আমার আব্বা প্রথমে আঞ্জুমান এবং পরে মুসলিম লীগ আন্দোলনের সাংগঠনিক পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলা লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির জন্ম-লগ্ন থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। আমাদের বাড়ীতে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর আনাগোণা ছিল বরাবর। তখন আমার ছেলেবেলা। একবার সুভাস বসু এলেন আমাদের জঙ্গীপুর শহরে। সেবার মওলানা আজাদও এসেছিলেন মনে হচ্ছে। বহরমপুরে মুসলিম লীগ কনফারেন্স হল। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বক্তৃতা শুনলাম সেই প্রথম।

"ভারত ছাড়" আন্দোলনের সময় স্থানীয় ফৌজদারী কোর্টের সামনে পাঠান পুলিশ লাঠিচার্জ করে শোভাযাত্রা ভেঙ্গে দিল। আমার দু'জন সহপাঠি জেলে গেলেন। বলাবাহুল্য, সে আন্দোলনে আমরা কোন অংশ গ্রহণ করিনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আব্বা ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের সাব ডিভিশনাল লীডার ছিলেন।

সেই যুদ্ধ যখন বামপন্থীদের দ্বারা 'জনযুদ্ধ' হিসাবে আখ্যায়িত হল তখন থেকে আমাদের বাড়ীতে ফ্যাসি-বিরোধী প্রচার পুস্তিকা আসতে থাকে। বিভিন্ন ধরনের মতাদর্শের পত্র-পত্রিকা সাগ্রহে পড়তে শুরু করলাম। মাসিক 'সোভিয়েত রাশিয়া' ক্রোড়পত্র থেকে একবার রুশভাষা শেখার চেষ্টা করলাম। নিজের নাম লেখা শেখা ছাড়া সে বিদ্যা বেশীদুর এগুলো না। এই পরিবেশে আমার বয়সের তুলনায় অনেক বড় ও গুরুগম্ভীর প্রশ্ন আমার মনে তোলপাড় করতে লাগল। প্রতিদ্বন্দী পেলেই তর্কে মেতে উঠতাম। একবার এক সভায় আমার আব্বা সভাপতিত্ব করছিলেন। আমি হঠাৎ দাড়িয়ে মুসলিম লীগের কোনও কোনও নীতির সমালোচনা করে বসলাম। যথাযথ সৌজন্য প্রকাশ করে আব্বা অবশ্য জবাব দিলেন। পিতা-পুত্রের বাকযুদ্ধে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী বেশ কৌতুক অনুভব করলেন।

ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলাম আই-এ পড়ার জন্য। তখন পার্কে, ময়দানে ও ইন্সটিটিউটের উল্লেখযোগ্য প্রতিটি সভায় উপস্থিত থাকার চেষ্টা করতাম। লেখাপড়ার জন্য সময় পেতাম কম। জিন্নাহ, নেহেরু, আবুল হাশিম, বঙ্কিম মুখার্জী, সত্যেন মজুমদার, হীরেন মুখার্জী প্রমুখ খ্যাতনামা বাগ্মীর বক্তৃতা শুনতাম অবাক বিস্ময়ে। সোদপুর আশ্রমে একবার গান্ধীকে দেখতে গেলাম। সেদিন ছিল তাঁর মৌনব্রতের দিন। গান্ধীর বক্তৃতা

আমার আর শোনা হল না। রশিদ আলী দিবসে আহতদের জন্য কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে রক্তদান করতে গেলাম। তখন আমার ওজন ছিল আশি পাউন্ড। ডাক্তার আমাকে দেখে হাসলেন এবং আমি লজ্জা পেলাম। শেষ পর্যন্ত আমার কয়েক সি সি রক্ত গ্রহণ করায় আমি বিব্রত অবস্থা থেকে উদ্ধার পেলাম। সে সময় আমাকে সবচেয়ে আকর্ষণ করতো আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের আদর্শ। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পেই পাকিস্তানের আন্দোলন—সেই যুক্তি সেদিন যেমন ছিল চিত্তাকর্ষক তেমনি গ্রহণযোগ্য। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্টের পর সবচেয়ে ঘৃণা করতে শিখলাম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে। অন্য কোনও অবস্থায় মানুষকে আমি এত অসহায় দেখিনি।

মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হিসেবে মুর্শিদাবাদ জেলা পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় আব্বা খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। খুলনার বিনিময়ে মুর্শিদাবাদকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার আব্বার গোপন চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে গ্রেফতার করেন এবং বহরমপুর জেলে বেশ কয়েকদিন আটক রাখেন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আব্বা কংগ্রেসে যোগদান করার আহবান প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৪৮ সালে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে তিনি রাজশাহীতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এর পূর্বেই ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে আমি রাজশাহী কলেজে ভর্তি হই বি এ পড়ার জন্য।

রাজশাহী কলেজের ফিজিক্স বিল্ডিং-এর নীচে দাঁড়িয়ে রেডিও সম্প্রচার থেকে জিন্নাহ্ সাহেবের সেই ভাষণ আমি শুনি যখন তিনি একতরফাভাবে ঘোষণা করলেন ঃ "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা"। সেদিন আমি মনে খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। সর্বজনসম্মানিত দেশনায়কের হাতে আমার মনের প্রিয় আদর্শ আত্মনিয়ন্ত্রণের এমন অবমাননা আমি আশা করিনি। কখন আমার মনের গহনে (হয়ত সমমনা অনেকের অন্তরেও) একটা বিশিষ্টতাবোধ অগোচরে সঞ্চারিত হয়ে গেল। এরপর, বাংলাভাষা বিরোধী প্রতিটি উক্তি ও আচরণ সেই বিশিষ্টতাবোধকে পুষ্টিদান করতে থাকে। সেই স্বাতন্ত্র্যবোধ কখন ঋদ্ধিলাভ করে আত্ম-আবিষ্কারে ব্যাপৃত হয় তা আমার খেয়াল নেই। শুধু দেখলাম, রাজহংসের শুভ্রপালকে যেমন কালিমালেপন সম্ভব হয় না, তেমনি সেই বিশিষ্টতাবোধের বিরুদ্ধে কোনও প্রচার বা প্রয়াস সফলকাম হল না।

রাজশাহী কলেজে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের আহবানে হরতাল পালিত হয়। সেই ধর্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আমিও সেদিন পিকেটিং করি। বাংলাভাষার দাবীর প্রশ্নে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা শিক্ষিত জনসমাজেও তেমন কোনও বিশেষ আগ্রহ সেদিন পরিলক্ষিত হয়নি। যাঁরা বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিশেষভাবে চর্চা করতেন এবং পরে যাঁরা বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধিকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তাঁদের অনেকের মধ্যে কোনও উৎসাহ সেদিন দেখিনি। দু'একজনকে কোনমতেই সেই ধর্মঘটে যোগদান করাতে আমরা সক্ষম হলাম না। সে সময় মুহম্মদ সুলতান, গোলাম রহমান ও একরামুল হক ছাত্র-রাজনীতিতে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। আমার কোনও বিশেষ ভূমিকা বা প্রভাব ছিল না।

এম এ পড়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই সলিমুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে। ঢাকায় আসি ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর কি ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে।

লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও ছাত্র সমাজে যখন কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠত তখন চুপচাপ না থেকে সরাসরি সাড়া দিতাম। উপনিবেশবাদ, ভিয়েতনাম, বর্ণবৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা,

পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন ও ছাত্রদের দাবী-দাওয়া ইত্যাদি ছোট-বড় সব ব্যাপারে নিজস্ব একটা বক্তব্য রাখার প্রেরণা অনুভব করতাম। ছোটখাট সব আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে না পারলে নিজেকে অপরাধী মনে হত। ফরাসী শব্দ "আঁগাজে" (বাংলা শব্দ 'নিয়োজিত' না 'নিবেদিত' হবে ?) বলতে যা বুঝায় মনের অবস্থা ছিল তাই। মনে হত, যেন সারা পৃথিবীটা আমাকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করছে। সকল সমস্যার আশু সমাধান যেন সন্নিকটে। কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠার একটা অস্পষ্ট ধারণা মাথার ভিতর পাক খেত। নিজেকে প্রগতিবাদী বলে পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করতাম। কিন্তু আমার সেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবেগ কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষা পেল না। তৎকালীন কোনও ছাত্র প্রতিষ্ঠানের জন্য আমি কোনও বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করতাম না। একটি অপরিণত ও অতৃপ্ত রাজনৈতিক চেতনা আন্দোলনের তাৎক্ষণিকতায় মেতে উঠল। এই ভাসমান অবস্থা কেবল আমার একার ছিল তা নয়। আমার সমসাময়িক বহু বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই সেদিন কোনও ছাত্র প্রতিষ্ঠানেরই সদস্য ছিল না। পরে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের প্রচেষ্টায় ছাত্র ইউনিয়নের জন্ম হয়। আমার তখন ছাত্র জীবনের শেষ, এবং কর্মজীবনে আমি অধ্যাপনা শুরু করেছি।

সেদিন কোনও ছাত্র প্রতিষ্ঠানের সংগে জড়িত না থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজে আমার ও আমার বন্ধু-বান্ধবদের একটা সীমিত প্রভাব ছিল। এই প্রভাবের সৃষ্টি হয় হল-ইউনিয়নের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। ১৯৫১ সালে আমাদের বন্ধু-বান্ধবরা ফজলুল হক হল—ইউনিয়নের নির্বাচনে জয়ী হন। আমি সলিমুল্লাহ হলের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হই। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব নির্বাচিত হন সাধারণ সম্পাদক। নিখিল পাকিস্তান ছাত্র লীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের যোগসাজশে আমার পক্ষে হল-ইউনিয়নের বাজেট পাশ করা সম্ভব হয়নি। আমার কর্মকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেব যেদিন ঘোষণা করলেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' তার পরের দিনই পুরানো আর্টস্ বিল্ডিং-এর আমতলায় তড়িঘড়ি একটা সভা করে আমরা সেই ঘোষণার নিন্দা করি। মনের রাগে ও দুঃখে সেদিন আমি বলেছিলাম, "শুনেছি ফ্যাসিস্ট ইতালীতে শ্লোগান দেওয়া হত—মুসোলিনি কোনদিন ভুল করে না। দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশে অনুরূপভাবে আমাদের উপর একটা সবক চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, জিন্নাহর কথাই অভ্রান্ত। তার নড়চড় হবে না।"

জিন্নাহ সাহেবকে কায়েদে আযম হিসেবে উল্লেখ না করায় দু'-একজন ছাত্র মারমুখো হয়ে প্রতিবাদ করে ওঠে। কিন্তু আমার গায়ে কেউ হাত তোলেনি সেদিন। সে সময়ে ছাত্রদের মধ্যে মতানৈক্যের জন্য হাতাহাতির কোনও নজির ছিল না। কোনও রাজনৈতিক নেতার উল্লেখ করার সময় তাঁর পিতৃদত্ত নাম উচ্চারণ করাই আমার কাছে বরাবর সমীচীন মনে হয়েছে।

শীঘ্রই ঘটনার দ্রুত পরিবর্তন ঘটল। ২০শে ফেব্রুয়ারীর সন্ধ্যাটা আমার কাছে খুব থমথমে মনে হচ্ছিল। কি রকম একটা বিপদ-সঙ্কেতের মত শোনাচ্ছিল সরকারী গাড়ী থেকে ১৪৪ ধারা জারীর সংবাদ পরিবেশনটি। যখন শুনলাম সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তখন আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হই। মনে হয়েছিল, আমাদের আন্দোলনকে কারা যেন বানচাল করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। রাত ন'টা-দশটার সময় আমরা সাত-আটজন বন্ধু-বান্ধব মিলিত হই ফজলুল হক হলের পুকুরের পূর্ব পাড়ে। যতদূর মনে পড়ে সেখানে মুহম্মদ সুলতান, আবদুল মমিন, জিল্লুর রহমান, কামরুদ্দিন শহুদ, গাজীউল হক, আনোয়ারুল হক খান ও এম আর আখতার উপস্থিত ছিলেন। অনেক পরে শুনেছি যে, ঐ বৈঠকে একজন

গুপ্তচরও উপস্থিত ছিলেন। আমি এখন তাঁর চেহারা মনে করতে পারছি না। ঐ সভায় একটা প্রশ্ন ওঠে, বিনা প্রস্তুতিতে ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে অযথা শক্তি ক্ষয় করা হবে কিনা। মুসলমান ছাত্র সমাজে আইন ভাঙ্গার তেমন রেওয়াজ ছিল না বললেই চলে। কলকাতায় রশিদ আলী দিবস, ভিয়েতনাম দিবস ও আরও অন্যান্য আন্দোলনের সময় আমি ১৪৪ ধারার বিধি-নিষেধ অমান্য করতে চেয়েছিলাম। সেদিন রাতে অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হল ১৪৪ ধারা ভাঙ্গতে হবে এবং আন্দোলন বন্ধ করা চলবে না। আমরা কেমন করে আইন অমান্য করব তার কোনও স্পষ্ট ছবি তখন আমাদের মনে ছিল না। তরুণ মনে এই আশা ছিল যে, একবার ১৪৪ ধারা ভাঙ্গলে বেশীর ভাগ ছাত্রই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবে আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য। পরের দিন সকালে আমি আর মোহাম্মদ সুলতান জগন্নাথ কলেজ ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি স্কুলে গেলাম ধর্মঘট কেমন চলছে দেখার জন্য। নওয়াবপুরে আওয়ামী লীগের অফিসে একবার ঢুঁ মেরে দেখলাম, ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা উচিত হবে কিনা এই নিয়ে বেশ কথাবার্তা চলছে। শহরে তখন একটা উত্তেজনার ভাব। আর্টস বিল্ডিং-এ ফিরে এসে দেখি মিটিং শুরু হয়েছে। গাজীউল হক দু'হাত তুলে সভা পরিচালনা করার চেষ্টা করছেন। আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী শামসুল হক সাহেব নিজের অনেক কথা বলে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরোধিতা করলেন। এমন সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের কন্‌ভেনার আবদুল মতিন সাহেব অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাথে প্ল্যান দিলেন যে, একসাথে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গলে পুলিশ লাঠিচার্জ করতে পারে। সুতরাং দশজন দশজন করে ছোট ছোট দল এগিয়ে যাবে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গবার জন্য। গাজীউল হক সেই প্ল্যানকে সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে ঘোষণা করলেন।উত্তেজনায় জমায়েত ফেটে পড়ল। ভাইস চ্যান্সেলার মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেব সকলকে এবার শান্ত করার চেষ্টা করলেন। আইন ভাঙ্গার প্ল্যানে এমন একটা অতর্কিত ভাব ছিল যে, অনেকে ভাল করে বুঝতে পারল না কি করতে হবে। আগের রাতে যাঁদের মধ্যে আইন ভাঙ্গার ব্যাপারে একটু ইতস্ততঃ ভাব ছিল, দেখলাম, তাঁদের সেই দোটানা ভাব কখন কেটে গেছে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছাড়বে বলে অনেকে রুমাল ভিজিয়ে নিল। ভিড়ের মধ্যে আমিও আমার রুমালটা ভিজিয়ে নিলাম। তার জন্য মনে কেমন যেন একটা লজ্জা হচ্ছিল। প্রক্টরের গেটের কাছে ক্রমশঃ ভিড় জমছে, কিন্তু রাস্তায় বের হওয়ার কোনও উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। চতুর্দিকে একটা বিশৃঙ্খলার ভাব। কেউ কারও কথা শুনছে বলে মনে হচ্ছে না। আমি দেখলাম, আমাদের আগের দিনের প্ল্যান প্রায় ভেস্তে যাবার যোগাড়। হঠাৎ করে আমার মনে হল, আমরা কয়েকজন যদি গেটের বাইরে গিয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গি তবে কেমন হয়। আমাকে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গতে হবে এমন কোনও পূর্ব-সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল বলে আমার মনে নেই। আমি যেহেতু আগের দিন ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার উপর জোর দেই সেজন্য বন্ধুদের একটা প্রত্যাশা ছিল যে, আমি প্রথমে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার জন্য এগিয়ে যাব। যাঁরা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার জন্য এগিয়ে এলেন মোহাম্মদ সুলতান তাঁদের নাম লিখে নিলেন। আমি তাঁকে বললাতম ঃ "তুই আমার পঙ্খীরাজটা (সাইকেল) দেখিস, আমি চললাম"। গলা ফাটিয়ে "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে গেলাম কয়েকজনকে সাথে করে। তখন বেলা সোয়া একটা। উত্তেজনায় সারা গা থেকে তখন আগুনের ভাপ বের হচ্ছে। প্রথমে পুলিশ আমাদের ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে এবং পরে রাস্তার একধারে ঘেরাও করে রাখে।

আর্টস বিল্ডিং-এর উপর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে দেখলাম, আমার দু'-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু দোতালা থেকে আমাদেরকে লক্ষ্য করছেন। আমরা এগিয়ে যাওয়ার পর যখন অন্যান্য ছাত্ররা

গেট পার হয়ে রাস্তায় নামতে শুরু করল তখন আমাদের কয়েকজনকে পুলিশ একটা ট্রাকে তুলে নিল। ট্রাক যখন তেজগাঁও-এর দিকে চলতে শুরু করল তখন মনের অবস্থা হাল্কা করার জন্য আমি বললাম "দূরে কোথাও কোনও মজা পুকুরে আমাদের চ্যাংদোলা করে ছুঁড়ে ফেলা হবে।" ট্রাকটা চলার সাথে সাথে ঠান্ডা হাওয়ায় মানসিক উত্তেজনা কিছু কমল, কিন্তু দুর্ভাবনা বাড়তে থাকল। অবশেষে আমাদেরকে তেজগাঁও পুলিশ ষ্টেশনে হাজির করা হল। ছোট্ট একটা হাজতঘরে আমাদের দশ-বারোজনকে একসাথে আটকে রাখা হল। হাজতঘরে আরও দুই-একজন আসামী ছিল। ঘরে প্রস্রাবের গন্ধে টিকতে না পেরে আমরা চেঁচামেচি করি। পরে আমাদের বড় একটি খোলা ঘরে থাকার অনুমতি দেয়া হয়। রাত্রে দারোগা সাহেবের অফিস-ঘরে মাটিতে শোয়ার জন্য ঢালাও বন্দোবস্ত করা হল। পোড়া খিচুড়ি খেয়ে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ রাত তিনটায় ঘুম ভাঙ্গল। ফিস ফিস করে কানাকানি করছে সবাই। শুনলাম ঢাকায় গুলি চলেছে। ধীরে ধীরে কথাটা প্রত্যেকের কানে পৌছল। অল্প শক্তির একটি ঘোলাটে বিজলী বাতির আলোয় বড় ঘরটার আবহাওয়া ক্রমেই ভারী হয়ে উঠল। সকালে আমাদের পুলিশভ্যানে করে ঢাকা কোর্টে নিয়ে যাওয়া হল। রাস্তা একবারে জনশূন্য। সব খাঁ খাঁ করছে। কোর্টে পৌছে দেখি কোর্ট চত্বরে লোক গিস্ গিস্ করছে। পুলিশ আর সেনাবাহিনী চারধার ঘিরে রেখেছে। জনতার মধ্যে থেকে কেউ কেউ আমাদের জন্য কিছু খাবার এনে দিলেন। বন্ধুদের পরামর্শে অবাঙ্গালী পুলিশ ও সৈন্যদের উদ্দেশ্যে উর্দুতে কয়েক মিনিট বক্তৃতা করার চেষ্টা করলাম। কয়েকখানা 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকাও পোড়ানো হল। ঘন্টা খানেকের মধ্যে কোর্টে হাজির না করেই আমাদের ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে নেওয়া হল। পরে শুনলাম, খুনের চেষ্টা, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সহকারে দাঙ্গা, কর্তব্যরত সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে হামলা ইত্যাদি অভিযোগ আমাদের অভিযুক্ত করা হয়েছে। বিচারাধীন কয়েদীর নম্বর ৪৭৭ হল আমাদের পরিচয়। বেশ কয়েকদিন পর জেলের মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আমাদের হাজির করা হল। আমরা এই বলে সাফাই দিলাম যে, "১৪৪ ধারা অন্যায়ভাবে জারী করা হয়, সেই ভেবে আমরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করি।" যতদুর মনে পড়ছে আমি ১১ই মার্চ জেল থেকে বেরিয়ে আসি।

জেলে আমাদের কোনও ক্লাশ দেওয়া হয়নি। একটা লম্বা ঘরে সাতাশ আটাশ জন মিলে আমরা রাত কাটাতাম। আমাদের প্রত্যেককে দুটো করে কম্বল দেওয়া হয়। আমার একপার্শ্বে থাকতেন এস এ বারি এ টি আর একপাশে নেয়ামল বশির। ইকবালের একটা বই থেকে নেয়ামল বশির কবিতা পড়ে শোনাতেন। দু'একবার আলোচনা-চক্রের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সেই আবহাওয়ায় তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। জেলের মধ্যে নানা ধরনের শ্লোগান দেওয়া হত। "নূরুল আমিন-গদি ছাড়" এই শ্লোগানটা তখন আমরা তেমন পছন্দ করতাম না। আমাদের কেমন একটা আশংকা হতো যে, ক্ষমতা দখলের লড়াই-এ কেউ আবার বাংলা ভাষার আন্দোলনকে বিপথে চালিত না করে। পুলিশের ভয়ে লোক এত অতিষ্ঠ ছিল যে, আমার বন্ধু-বান্ধব কেউ আমার সাথে জেলে দেখা করতে আসতে পারেননি। রাজশাহী থেকে আব্বা এলেন দেখা করার জন্য। জেলখানার কম্বল গায়ে দিয়ে দাড়িভরা মুখ নিয়ে যখন তাঁর সামনে গরাদের এপাশে দাঁড়ালাম তখন দেখি তাঁর চোখ ছল্‌ছল্ করছে। আমি অত্যন্ত বিব্রতবোধ করলাম। পিতাপুত্রের মধ্যে প্রায় কোনও কথাই হল না। "কারাবরণ" কথাটার মধ্যে একটা ব্রত উদযাপনের ভাব আছে, আত্মনিগ্রহ ব্রতের। জেল আমার ভাল লাগেনি।

জেল থেকে বেরিয়ে আমি রাজশাহী যাই। কয়েক সপ্তাহ পরে ঢাকায় ফিরে আসি। ল'য়ের কয়েকটা ক্লাশ তখনও বাকী ছিল। পয়লা মে আমার শিক্ষক, প্রফেসর হালিম সাহেবের

আমন্ত্রণে ইতিহাস বিভাগের অস্থায়ী লেকচারার পদে যোগদান করি। আমার হাজত-বাসের কথা উল্লেখ করে শীঘ্রই ভাইস চ্যান্সেলরের কান ভারী করা হয়। কোন কোন সহযোগী আমাকে বিশেষ বর্ণে রঞ্জিত করে ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে অভিযোগ করেন। ৪ঠা মে প্রফেসর হালিম আমাকে ডেকে সব কথা বললেন। তাঁকে চিন্তান্বিত দেখে আমার খারাপ লাগল। আমি বললাম, "আমার জন্য যদি আপনার বা ইউনিভার্সিটির কোনও অসুবিধা হয়, তবে আমি পদত্যাগ করছি।" অনুরূপ ভাষায় তাঁকে একটি পদত্যাগপত্র দিলাম। ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেব অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে আমার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন। এরপর বিচ্ছিন্নভাবে কয়েক বছর সিরাজগঞ্জ কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং রাজশাহী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপনা করি। ১৯৫৬ সালে স্কলারশিপ পেয়ে অক্সফোর্ড যাই ইতিহাসে অনার্স পড়তে। ইতিমধ্যে ১৯৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষা দেশের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেয়ে গেছে।

আরবী, উর্দু, বাংলা ও ইংরেজী এই চার ভাষা নিয়ে আমার প্রাথমিক পাঠ শুরু। দুস্‌রি বা তিস্‌রি কেতাবের পর পাঠ্যতালিকা থেকে উর্দু খ'সে পড়ে। আমার আব্বা বি এ পর্যন্ত সংস্কৃত পড়েন। তাই নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলার হিসাবে যখন কোনও উর্দু সার্কুলার বা চিঠি পেতেন তখন তিনি আমার শ্মরণাপন্ন হতেন। আমি উর্দু লেখা চিঠির মর্মোদ্ধার করতে না পেরে বিরক্ত হতাম। মনে হত আব্বার উপর কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ দপ্তর যেন অভদ্রভাবে একটা জুলুম করছেন।

বস্তুতঃ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ তথা ভারতীয় মুসলিম সমাজ উর্দু বনাম হিন্দির প্রশ্নে বরাবর উর্দুর পক্ষে ওকালতি করে এসেছিলেন। আমাদের দেশের মক্তব-মাদ্রাসায় ও ওয়াজ-মাহফিলে উর্দুর বেশ প্রচলন ছিল। কোনও কোনও সময় বইয়ে লেখা হত, সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের ভাষা উর্দু। ভারতীয় মুসলমান সমাজের যখন নিজস্ব 'ওতন' বা বাসভূমি হিসাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হল, তখন স্বাভাবিকভাবে নেতাদের মনে হয়েছিল 'কওমী জবান' উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে হবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের কাছে জিন্নাহ্ সাহেবের একরোখা মন্তব্যের একটা যৌক্তিকতা ছিল বই কি ! জিন্নাহ্ সাহেব বা নাজিমউদ্দীন কেউই ভাল উর্দু বলতে পারতেন না। তাঁদের চেয়ে এদেশের অনেক মওলানা বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ভাল উর্দু বলতে পারতেন। পূর্ব-বাংলায় সহস্রাধিক মক্তব-মাদ্রাসার বহু মৌলভী মওলানা ও তাল্‌বে এলেম উর্দু ভাষায় মোটামুটিভাবে পারদর্শিতা লাভ করেন। পাকিস্তানের পশ্চিম অঞ্চলে বাংলা ভাষার কোনও চলই ছিল না। পূর্ব-বাংলার রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের অনেক সময় তাঁদের পশ্চিমা সমকক্ষদের সঙ্গে ইংরেজীর চেয়ে ভাঙ্গা উর্দুতে কথা বলতে স্বস্তি বোধ করতে দেখা যেত। এমন অবস্থায় উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার চিন্তা করা মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না। দুই অঞ্চলের ভৌগোলিক ব্যবধানের ক্ষেত্রে সেতুবন্ধ হিসাবে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কার ভূমিকায় উর্দুর একটা স্থান হয়তো ছিল। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গি।

বস্তুতঃ বঙ্গপ্রদেশের ভোটেই পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব নিলেন পশ্চিমা মুসলমান নেতৃবৃন্দ এবং দেশপ্রেমের একমাত্র দাবীদার সাজলেন অধিকারীর বেশে। রাষ্ট্রের মঙ্গল কামনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার সৃষ্টিকর্তা যেন তাঁদের হাতে সঁপে দিয়েছেন। বিত্তবান ও প্রভাবশালী পশ্চিমা নেতৃত্বকে কেমন যেন সহজে মেনে নিল পূর্বাঞ্চলের মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ। এমনিতেই, এদেশে সে পশ্চিমা ব্রাহ্মণই হোক বা মওলানাই হোক তার কদর

বেশী। পশ্চিমা নেতৃবৃন্দের মুরুব্বিয়ানার সামনে পূর্ব-বাংলার নেতৃবৃন্দের হীনমন্যতায় তরুণ ছাত্রসমাজ হল অত্যন্ত মর্মাহত। পশ্চিমা নেতৃবৃন্দের কথাবার্তায় ও আচরণে এমনভাব প্রকাশ করতেন যে, 'এদেশের মুসলমান সত্যিকারের মুসলমান নয়, এখানকার মানুষ কোনদিন স্বাধীন ছিল না, এরা হিন্দু দেবদেবীর পূজা করে, হিন্দুদের কাছ থেকে সবক্ নেয় এবং তাদের কথায় উঠে বসে'। পূর্ব-বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে এক নিরবচ্ছিন্ন চরিত্রহনন চলতে থাকল। কাজে কর্মে মুসলিম সৌভ্রাতৃত্বের কথা ফাঁকা ও অসার শোনাল। এক সময় এদেশের একজন গভর্ণর মালিক ফিরোজ খান নুন এক চরম অসৌজন্যমূলক উক্তি করে বসলেন, "এদেশের মুসলমানদের নাম হিন্দুর মত, এদেশের মুসলমানরা মুসলমানী করে না।" তরুণ পূর্ব-বাংলার সবচেয়ে খারাপ লাগল যখন দেখা গেল নেতৃস্থানীয় কোনও নেতা পশ্চিমা মুরুব্বিয়ানার তেমন কোনও প্রতিবাদ করলেন না। আমাদের নেতৃবৃন্দ জানলেন না কখন তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন দেশের যুব সমাজের আস্থা।

রাজনৈতিক উৎপীড়ন বা অর্থনৈতিক শোষণের তাৎপর্য মানুষকে বোঝাতে হয়। সময় লাগে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে। কিন্তু মানুষের আত্মমর্যাদা যখন আহত, তখন সে বিক্ষুব্ধ হয় সহজেই। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত এদেশের যুব সমাজের আত্মমর্যাদা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে এক নিদারুণ আঘাত হিসাবে দেখা দেয়। ক্ষোভ, আবেগ, বুদ্ধি ও যুক্তির একীভূত সমাবেশে দুর্বার হল সেই আন্দোলন। একটা ঔপনিবেশিক নিপীড়নের অবস্থার সৃষ্টি হল।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দিলে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে যাব এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অন্যদের কাছে হেরে যাব। সে ধরনের ঠান্ডা মাথার যুক্তি তখন আমরা তুলতাম না। সুইৎজারল্যান্ড, কানাডা, বেলজিয়াম ইত্যাদি বহু রাষ্ট্রভাষা-ভাষী রাষ্ট্রের কথা আমাদের আলোচানায় উল্লেখ পেত বটে, তবে বেশীর ভাগ সময় বাংলা ভাষার দাবীকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোনও যুক্তি প্রদর্শন তখন তরুণ মনে বাহুল্য মনে হত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার এক বিদেশী অধ্যাপক পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জনসংখ্যার হিসাব করে ভাষা আন্দোলনের উপর মন্তব্য করেছিলেন **"ইট ইজ সিম্পল ম্যাথামেটিক্স"**। বাংলা ভাষার দাবীর পেছনে এমন একটা সহজ ও বোধগম্য যুক্তি ছিল যে, কোনও অপপ্রচার দ্বারাই তা খন্ডন করা সম্ভব হলনা। আবেগে, বিক্ষোভে এবং যুক্তিপ্রমাণে সেই আন্দোলন এমনই দুর্বার হয়ে দাঁড়ালো যে আইনের কোনও বাধা তার মানার কথা নয়। তাই চার বছর পরেই রাষ্ট্র ভাষার দাবী দেশের সংবিধানে স্বীকৃতি পেল। ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেয়েই শেষ হয়ে গেল না। জাতির প্রতিটি প্রশ্ন, আশা ও আকাঙ্খা এর পরও আবর্তিত হতে থাকল একুশে ফেব্রুয়ারীকে কেন্দ্র করে।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবী অনেক সময় বহুবাচনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে একটা বিরোধের সৃষ্টি করে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে অবশ্য সে ধরণের কোন বিরোধের প্রশ্ন উঠার কথা নয়। তবু 'শিশু' রাষ্ট্রের সংহতির দোহাই যাঁরা পাড়তেন তাঁদের মধ্যে একটা আশঙ্কা দেখা দেয়। সেদিন ভিন্ন কণ্ঠে একটি ক্ষীণ আওয়াজ শোনা যেত "রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই।" এই আশঙ্কায় আরবী হরফে বাংলা চালু করার এবং বাংলা ভাষাকে 'শুদ্ধ' করার একটা চেষ্টা মাঝে মাঝে দেখা দিত। কিন্তু সকল প্রচেষ্টাই শেষ পর্যন্ত কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা বা গুরুত্ব লাভ করতে পারল না। সবই হল পন্ডশ্রম। অবশেষে, যে রাষ্ট্র নিয়ে হিতৈষীদের এত দুর্ভাবনা, ইতিহাসের ঘটনাক্রমে দু'দশকের মধ্যে কালস্রোতে ভেসে গেল সেই রাষ্ট্র।

মাতৃভাষা-চেতনা

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

ভাষার যে কী অমিত পারঙ্গমতা আজকের মানব সভ্যতার চরমোৎকর্ষ তার পরিচায়ক। মানুষতো জন্মায় অসম্পূর্ণ মানবক হয়ে, জন্তু হয়ে। তারপর দিনে দিনে তার কেবলমাত্র প্রাণিত্বের সীমাবদ্ধতা ঘুচিয়ে সে মানুষ হয়ে ওঠে। তার প্রাণিত্ব-মুক্তির এই প্রক্রিয়ায় গোড়ায় কাজ করে ভাষা। তখন পরস্পরে মিলে ভাবের, চিন্তার, মনের আদান-প্রদানে মানুষ গড়ে তোলে সমাজ। সমাজের যে মেলবন্ধন সেতো ঐ ভাষারই অবদান—সমাজ এবং সমাজের লোকদের মধ্যে এই প্রাণগত মনোগত মিলনেরও আদান-প্রদানের উপায় স্বরূপে মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সৃস্টি সে হচ্ছে তার ভাষা। এই ভাষার নিরন্তর ক্রিয়ায় সমস্ত জাতকে এক করে তুলেছে; নইলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে মানবধর্ম থেকে বঞ্চিত হত। এবং আমরা আরো অবগত যে, সমাজের সৃষ্টি থেকেই মানব সভ্যতার যাত্রারম্ভ। মূলত বলবার কথাটা হল—ভাষাই মানুষকে মানুষ করে তোলে। এবং সমাজ-সৃষ্টি, সভ্যতার উদ্ভব-বিকাশ সমস্ত কিছুর মূলে রয়েছে মানুষের ভাষা-আবিষ্কার। ভাষা হচ্ছে মানুষের হাতিয়ার, তার ঐশ্বর্য।

তারপর কালের যাত্রায় সমাজ-বিকাশের বিবর্তনে একদা কতিপয় মানুষের ব্যষ্টি-স্বার্থচেতনা প্রবলতর হয়ে উঠলো। স্বভাবতই তখন প্রয়োজন দেখা দিল সামাজিক হাতিয়ারকে করায়ত্ব করবার। স্বার্থটা হল সমাজ জীবনে উচ্চতর মর্যাদাকে কুক্ষিগত করবার, সেই সাথে যাবতীয় বিত্ত সম্পদকে আপন অধিকারের অধীনে আনবার। বলা বাহুল্য, উভয় প্রয়োজনই ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর সম্পর্কিত। তাঁরা বললেন, তাঁরা উচ্চবর্ণ, তাঁরা দেবাশ্রিত, দেবতার আশীর্বাদ পুষ্ট। আর বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ, সভ্যতার পিলসুজ বহনে যারা শ্রম-দাস তারা হল প্রাকৃত মানুষ। তাই এদের ভাষা প্রাকৃত, আর ওঁদের ভাষা দেবভাষা, শিষ্টজনের ভাষা। সমাজ জীবনে যখন এমনতর পরিস্থিতি স্বভাবতই দেবভাষা তখন মুষ্টিমেয়ের ভাষা—তাঁরা সমাজনেতা, ধর্মনেতা, প্রশাসনের চাবিকাঠি তাঁদের হাতে। এই তিনে মিলে গাঁটছড়া। তাঁদের প্রয়োজন ক্ষমতার আর আধিপত্যের শিকড় দৃঢ়তর করা। সে কারণেই প্রাকৃত সাধারণের ভাষাকে অচ্ছুৎ পর্যায়ে নিবাসিত করা ব্যতীত আধিপত্যের সিংহাসন নিরাপদ নয়। কেননা ভাষাইতো শক্তি, ভাষা হচ্ছে হাতিয়ার। গণমানুষের সেই হাতিয়ারকে তাঁদের বড়ো ভয়। ভাষার ইতিহাসে যত দ্বন্দ, তলিয়ে বিশ্লেষণ করলে প্রতিভাত হবে, মূলত তা আধিপত্যবাদীর স্বার্থসংরক্ষণের মোকাবিলায় সাধারণ মানুষের স্বাধিকার দাবীর দ্বন্দ।

যুগে যুগে দেশে দেশে এমনটি ঘটেছে। এই উপমহাদেশে মাতৃভাষা সংস্কৃত আর পালি ভাষার দ্বন্দ, পরবর্তী পর্যায়ে বৌদ্ধ শাসনামলে পালি যখন রাজভাষা তখন প্রাকৃতের সাথে তার দ্বন্দ, বাংলায় ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের কালে 'দেশী' ভাষাকে অপবিত্র-জ্ঞান-একই ইতিহাসের অনুসৃতি। মোগল অধিকার আধিপত্যের কালে ফার্সী তখন রাজভাষা, 'দেশী' ভাষায় কাব্য রচনার দরুন কবি সৈয়দ সুলতানকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল 'মোনাফেক' বলে। শেষ পর্যন্ত বর্তমান শতকে আটচল্লিশ থেকে বাহান্নোর যে ভাষা আন্দোলন তা ত শাসক শক্তির আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বাধিকার অর্জনেরই আন্দোলন।

ভাষা ব্যাপারটা আসলে বিচ্ছিন্ন কোন ও নৈর্বস্তুক সত্ত্বামাত্র নয়, তার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে রয়েছে মানুষের জীবনের স্বার্থ।

জননী এবং জন্মভূমিকে বলা হয়ে থাকে স্বর্গ অপেক্ষা গরিয়সী। ভাষা-জননীও তেমনি——মাতৃভাষা এই ভাষা-জননী। মাতৃভাষা যে প্রাণের অধিক বাংলাদেশ বাহান্নোর ফেব্রুয়ারীতে রক্তের অক্ষরে সে ইতিহাস রচনা করেছে। আমরা নিজেরাই সে ইতিহাসের অঙ্গীভূত। পুনরায় ইতিহাসেরও পুর্বেতিহাস থাকে। কেননা জঙ্গম জীবনে পারম্পর্য-বিহীন আকস্মিকতার অবকাশ নেই, স্বয়ম্ভু বলে বলে কিছু নেই।সে কারনেই আমাদের মাতৃভাষা-চেতনারও উদ্ভব-বিকাশ প্রসঙ্গে অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে।

আমাদের মাতৃভাষা বিষয়ে সচেতনতা, বাংলা ভাষা বিষয়ে আমাদের আগ্রহ এবং প্রেম কত কালের প্রাচীন ? প্রাক্-উনবিংশ শতাব্দী কালে অবশ্য এক ধরনের ভাষা-চেতনার সাক্ষাৎ পাই। সে চেতনা প্রতিক্রিয়া-সঞ্জাত। দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে বাংলাদেশে তখন রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে ও সমাজ ব্যাবস্থায় দেবভাষা সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের কাল। সে কালে 'ভাষা'য় অর্থাৎ দেশজ লৌকিক ভাষায় শাস্ত্রচর্চাকে পরলোকে চরম শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করে নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল। ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল এই মর্মে—ভাষায় অষ্টাদশ পুরাণ, রামচরিত ইত্যাদি যে মানব শ্রবণ করবে তার গতি ভয়াবহ রৌরব নরকে।

সাধারণ মানুষের মাতৃভাষা-চর্চার ক্ষেত্রে ওপর তলার প্রধানদের এই ধরনের চরম বিধি-নিষেধ কেন ইতিপুর্বে আমরা তার হেতু-সন্ধানের প্রয়াস পেয়েছি। তবে প্রশ্ন জাগে——তখনকার মানুষের মনে এর কী কোনই প্রতিক্রিয়া হয় নি ? ১৩৫০ খৃস্টাব্দ নাগাদ শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলায় স্বাধীন সুলতানী স্থাপন করেন। আমরা জানি সুলতানী আমলে রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে সামন্ত ভূস্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের চর্চা উৎসাহিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, তার দরুন বাংলা ভাষা-চেতনা অবশ্যই প্রসার লাভ করে। কিন্তু পরবর্তী কালে মোগল শাসনামলে বিপরীত পরিস্থিতির সাক্ষাৎ পাই। ইতিমধ্যে এমন এক ক্ষমতাধর শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, যাঁরা দেশীয় জনের মাতৃভাষা-চর্চাকে অনুকূল দৃস্টিতে দেখেননি—বরং তার বিরোধিতা করেছেন। কবি আবদুল হাকিমকে (১৬২০-১৬৯০) এই ধরনের কটু বাক্য রচনা করে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে হয়-'যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ।।' এই জাতীয় নিদর্শন থেকে তৎকালীন বাংলা ভাষা-বিতর্কের কিছুটা সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এভাবে এক দিকে নিষেধ অপর দিকে প্রতিবাদ, এই দ্বন্দের ভেতর দিয়ে তখনকার ভাষা-চেতনার পরিচয় পাই।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ভাষা-অনুসন্ধান অবশ্য অনেক পরবর্তী কালের প্রয়াস। বাংলা ব্যাকরণ রচনার মাধ্যমে সেই প্রয়াসের সূত্রপাত। উনবিংশ শতকে কথাটা প্রথম শোনা গেল—সে কথা বাংলা ভাষার উদ্ভব নিয়ে, বাংলা ভাষার প্রকৃতি বিচার নিয়ে। তখনকার পন্ডিতজনের ধারণা ছিল, বাংলা ভাষা সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত। সে কারণে বলা হ'ত বাংলা সংস্কৃতের দুহিা। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ এই মতের প্রতিনিধিত্ব করে গেছেন। কিন্তু বিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে প্রমানিত হ'ল এ সিদ্ধান্ত যথার্থ নয় কল্পিত। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখ ভাষাপন্ডিতের গবেষনায় জানা গেল যে, বাংলা ভাষা অবশ্যই সংস্কৃত-দুহিতা নয়, এর জন্মেতিহাস, বিবর্তনের ইতিহাস অন্যতর।

সম্ভবত বিশেষ করে ঘোষণা করবার প্রয়োজন নেই যে, বাংলা হচ্ছে আর্য ভাষা। বলা বাহুল্য এই উপমহাদেশে আর্য আগমন এবং আর্য উপনিবেশ স্থাপন-বিস্তারের সাথে তাদের ভাষারও প্রসার ঘটে। এবং কাল ও পরিবেশের বিবর্তনের সাথে ভাষারও বিবর্তন ঘটে। এই ইতিহাস প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসরের ইতিহাস। ভাষাপন্ডিতেরা উপমহাদেশের ভাষাকে কালের দিক থেকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ

১· প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা (খৃ· পূ· ১৫০০-৬০০ অব্দ),

২· মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা (খৃ· পু· ৬০০ অব্দ-৮০০ খৃ·)। এই কালের ভাষা পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ, এবং

৩· নবীন ভারতীয় আর্য ভাষা (৮০০ খৃ·-আধুনিক কাল) এই কাল পর্বের ভাষা, গুজরাটি, রাজস্থানী, হিন্দী, উর্দু, উড়িয়া, অসমীয়-ইত্যাদি।

এইভাবে নবীন ভারতীয় আর্য ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার কালগত অবস্থান নির্দেশ করা হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যাপারটা ত' বিনা কার্যকারণহেতু আকস্মাৎ ঘটে যায় নি। ভাষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভু বলে কিছু নেই। মানুষের ভাষা কী কদাপি নির্ধারিত সন-তারিখ-দিন-ক্ষেত্রে মেনে জন্মায়? ভাষার উদ্ভবের ক্ষেত্রে তেমন পাঁজির হিসাবের সুযোগ নেই। মানব সমাজের প্রবৃদ্ধির সাথে, সভ্যতা-সংস্কৃতির অগ্রযাত্রার সাথে, মানুষের কর্মকান্ডের বিবর্তন ও তার অভিজ্ঞতার পরিবর্তনের সাথে বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, বিভিন্ন গ্রহন-বর্জনের মাধ্যমে ভাষা 'হয়ে হয়ে' ওঠে। বাংলা ভাষারও উদ্ভব-বিকাশের ক্ষেত্রে স্বভাবতই এমনটিই ঘটেছে।

তাই এদেশে জনবসতি স্থাপন ও বসতির বিস্তারের সাথে বাংলা ভাষার ইতিহাস অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কিত। সে ইতিহাস প্রাক্ আর্য-আগমন কালের কথা। ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চালে জনসৌধ কী ভাবে গড়ে উঠেছে সেই প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করা গেলে তার সন্ধান পাওয়া যাবে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, আর্য-উপনিবেশ স্থাপনের পূর্বে এতদঞ্চলের জনসমষ্টি আদি অস্ট্রেলিয়, মেলানি এবং এ্যালপাইন এই জনের সমন্বয়ে গঠিত— পন্ডিতদের এ রকম অভিমত। তাঁদের মতামত আলোচনা করে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এই সিদ্ধান্তে পৌছুচ্ছেন—'মোটামুটিভাবে ইহাই বাংলা ভাষাভাষী জনসৌধের চেহারা, এবং এই জনসৌধের উপরই বাঙ্গালীর ইতিহাসের সূত্রপাত।'[১] অতএব এই জনগোষ্ঠীর ভাষাই তৎকালীন বাংলাদেশে প্রচলিত, অর্থাৎ প্রাক্ আর্য যুগের ভাষা ছিল। তাদের ব্যবহৃত ভাষা-পরিবারের সাধারণ নামকরণ অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা। এর মধ্যে কোল-মুন্ডা ছিল বিশেষ সম্পন্ন গোষ্ঠীর ভাষা। এবং এই ভাষা-ভূখন্ডের সংলগ্ন ছিল দ্রাবিড়ভাষী জনপদ।

অন্য দিকে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে, বিশেষ করে গাঙ্গেয় উপত্যকায় আর্য উপনিবেশ-বসতির প্রসারের সাথে স্বভাবতই আর্য ভাষারও প্রসার সাধন ঘটে। এবং গঙ্গা নদীর অববাহিকা অনুসরণ করে আর্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে আর্য ভাষা এইভাবে বঙ্গদেশে বিস্তৃতি লাভ করে। ক্রমে মধ্য ভারতীয় আর্য-স্তরের প্রাকৃত অপভ্রংশ থেকে আধুনিক কালের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের উদ্ভব—বাংলা তার অন্যতম।

যাই হোক, উত্তরাঞ্চল থেকে পূর্ব ভারতে আর্য অভিযানের ফলে আদিবাসীরা শেষ পর্যন্ত কোথাও কোথাও উৎখাত হয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যন্তবাসী হয়েছে, কোথাওবা অপসৃত হয়েছে। প্রবলতর রাজশক্তির, প্রবলতর, সংস্কৃতি ও জীবন-কর্মকান্ডের প্রতাপে এবং প্রভাবে সর্বত্র এমনটিই ঘটে থাকে। বাংলাদেশে আর্য উপনিবেশ বিস্তারের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। স্বাভাবিক কারণেই প্রাক-আর্য অনার্য ভাষাকেও তেমনি নবাগত আর্য ভাষার জন্যে স্থান করে দিতে হয়েছে। তবে অবশ্যই সমগ্র ব্যাপারটি বহুকালাবধি নানাবিধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটেছে। এ কারণেই প্রাক্-আর্য যুগের ভাষার জন্যে স্থান করে দিতে হয়েছে। তবে অবশ্যই সমগ্র ব্যাপারটি বহুকালাবধি নানাবিধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটেছে। এ কারণেই প্রাক-আর্য যুগের ভাষার পলিস্তর পরবর্তীকালীন বাংলা ভাষা প্রবাহে রয়ে গেছে।

অতএব সেই প্রত্নকালীন অস্ট্রিক, কোল, মুন্ডা, দ্রাবিড়, তিব্বত-ব্রহ্মণ গোষ্ঠীর এমন অনেক শব্দরাজি,শব্দরীতি আধুনিক যুগের বাংলা ভাষায় আত্মস্থ হয়ে গেছে যেগুলি আমাদের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত যেমন-'কুড়ি' শব্দ, কুড়ি দিয়ে গণনারীতি; টি,অরু-অরু, অর-অরা, অল-আল ইত্যাদির প্রয়োগ; ড়া, গুড়ি,ভিটা,কুন্ড ইত্যাদি যোগে স্থানের নামকরণ; বাংলাদেশের অসংখ্য গ্রাম, নদী-নালা, বাজার-হাট গঞ্জের আপাত দুর্বোধ্য নাম; করাত, দা, বাইগন, পগার, বরজ, বাঁখারি, কানি এই সকল কতো শব্দ-সেই যুগের চিহ্ন, স্মৃতি বহন করে আনছে এবং আমাদেরকে সেই প্রত্ন-প্রাচীনের সাথে সম্পর্কিত করছে।

কালগত দিক থেকে বাংলা ভাষার আর্যীকরণ কবে থেকে? তেমন নির্দিষ্ট প্রমাণ-নিদর্শন না থাকলেও পন্ডিতরা মোটামুটি হিসেবটা ধরেছেন খৃ.পূ. ১০ম-৯ম শতক থেকে। মহাভারতের সভাপর্বে এদেশের উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশে আর্য-উপনিবেশ স্থাপনের সাথে বাংলা ভাষার আর্যীকরণের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এইভাবে তার বর্ণনা প্রদান করছেনঃ 'যাহা হউক অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও বেদবহির্ভূত আর্য ভাষাপ্রবাহের উপর তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল বৈদিক আর্য ভাষাপ্রবাহের প্রবল স্রোত। এক দিনে নয়. দ-দশ বৎসরে নয়, শত

শত বৎসর ধরিয়া এবং কালে কালে ক্রমে ক্রমে এই ভাষা সমস্ত পূর্বতন ভাষা-প্রবাহকে আত্মসাৎ করিয়া তাহাদের সংস্কৃতিকরণ সাধন করিয়া নিজের কে স্বতন্ত্র রূপ গড়িয়া তুলিল।' বাংলাদেশে প্রচলিত আদিম ভাষার কীভাবে সর্বাঙ্গীন রূপান্তর এবং কী ভাবে এক স্বতন্ত্র রূপ অর্জন সাধিত হয় সে সম্পর্কে ডঃ রায়ের বক্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বাংলাদেশের মূল ভাষাপ্রবাহের আর্যীকরণ হয় ন্যূনাধিক সহস্র বর্ষ ধরে। কালের হিসেবে এই আর্যীকরণ-প্রক্রিয়াকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা ঃ ক· ১০ম-৯ম খৃ· পূ· -৬ষ্ঠ খৃ· পূ। খ· ৬ষ্ঠ-৫ম খৃ· পূ· শতকে এদেশের পশ্চিমাঞ্চলে জৈন ধর্মের প্রসার ঘটে। মহাবীর জৈনের নেতৃত্বে নবাগত আর্য ধর্মমত প্রসারের সাথে তদঞ্চলে মধ্য ভারতীয় আর্য স্রোত প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। গ· খৃ· পূ· ৩য়-২য় শতকে মৌর্য সম্রাটদের শাসনকালে বাংলাদেশে আর্য ভাষার যে প্রভাব বিস্তৃত হয় তাকে বলা হয়েছে আর্য ভাষায় তৃতীয় প্রবাহ। এটাই আর্য ভাষার শেষ প্রবাহ-তখন এ ভাষার মাগধী প্রাকৃত স্তরে অবস্থান। অতঃপর বাংলায় যে প্রাকৃত ভাষার সাক্ষাৎ পাই সে ভাষা মাগধী-অর্ধ মাগধীর মোটামুটিভাবে মাগধী-অর্ধ মাগধীর মিশ্ররূপ, এবং তাতে অস্ট্রিক, কোল-মুন্ডা, দ্রাবিড়, তিব্বত-ব্রহ্মণ গোষ্ঠীর আদিম শব্দাবলী বিরাজমান ছিল। লিপি-পন্ডিতদের মতানুযায়ী এই ভাষার প্রস্তর-উৎকীর্ণ নিদর্শন বগুড়া জেলায় প্রাপ্ত মহাস্থানগড় শিলালিপি (পূর্বীপ্রাকৃত ভাষায়, ব্রাহ্মী অক্ষরে)। যাইহোক, কালক্রমে প্রাকৃতের রূপান্তর ঘটল অপভ্রংশে-প্রাকৃত এবং স্পস্টরূপে আদি-বাংলার সেতুবন্ধন এই অপভ্রংশ দিয়ে। খৃস্টীয় ৮ম থেকে ১২শ অব্দ অপভ্রংশে স্থিতিকাল বলে বলা হয়ে থাকে। যে বাংলা ভাষার সাহিত্যিক রূপ বা লিখিত রূপের সাথে আমরা পরিচিত, সে ভাষার উদ্ভব এই অপভ্রংশের বিবর্তনের মাধ্যমে। পন্ডিতদের মতানুযায়ী মাগধী কিংবা পূর্বী অপভ্রংশের ১ বিবর্তনের মাধ্যমে নবীন ভারতীয় আর্য ভাষারূপে বাংলা ভাষার উদ্ভব দ্বাদশ শতকের মধ্যে। তবে বলা বাহুল্য, এই ভাষা অবশ্যই অবিমিশ্র আর্য নয়, জীবিত ভাষার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীই বহু জনের মুখে, বহু জনপদব্যাপী, দীর্ঘ কালব্যাপী প্রবহমনতার পরিণতিতে মিশ্রভাষায় রূপ নিয়েছে। এ ভাষার প্রধান উপকরণ যথাক্রমে দেশজ অর্থাৎ আদিম অনার্য এবং বহিরাগত আর্য। উভয় উপকরণের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে বাংলা ভাষার মুল কাঠামো। এতাবৎকাল প্রাপ্ত বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যার ভাষা-সাধারণভাবে স্বীকৃত অভিমত অনুযায়ী এই ভাষা হাজার বছরের প্রাচীন।

হাজার বছরের বাংলা ভাষার ইতিহাসকে কালগত দিক থেকে তিনটে ভাগে ভাগ করা যেতে পারে- ক· আদি যুগের বাংলা ভাষা, খ· মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষা, এবং গ. আধুনিক যুগের বাংলা ভাষা। আদি যুগের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ভাষার সূচনায় 'চর্যাগীতিকার ভাষা, যার পরিণতির নিদর্শন বড়ু চন্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে'র ভাষা। বাংলা ভাষা-ইতিহাসের মধ্যযুগের কালপর্ব পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি ব্যাপ্ত।

হাজার বছরের বাংলা ভাষার ইতিহাসকে কালগত দিক থেকে তিনটে ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—ক· আদি যুগের বাংলা ভাষা, খ· মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষা, এবং গ· আধুনিক যুগের বাংলা ভাষা। আদি যুগের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ভাষার সূচনায় 'চর্যাগীতিকা'র ভাষা, যার পরিণতির নিদর্শন বড়ু চন্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে'র ভাষা। বাংলা ভাষা-ইতিহাসের মধ্যযুগের কালপর্ব পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি ব্যাপ্ত। ইতিপূর্বে ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই বাংলাদেশে বহিরাগত মুসলমানদের আধিপত্যের সূত্রপাত হয়েগেছে। মুসলমান শাসন আমলে আমাদের ভাষা-ইতিহাসের মধ্যযুগের কাল-পর্ব ব্যাপ্ত। এই যুগের ভাষা-নিদর্শনের সাক্ষাৎ পাই গুণরাজ

খান মালাধর বসু রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়', কৃত্তিবাস ওঝার 'শ্রীরামমঙ্গল পাঁচালী', বিভিন্ন মঙ্গল কাব্য, কাশীরাম দাসের মহাভারত, বৈষ্ণব পদ সাহিত্য, মুসলমান কবিদের কাব্য সাহিত্য, লোক-সাহিত্য ইত্যাদি রচনাসমূহে। কবিরা, বিদ্বজ্জনেরা অনুবাদ করেছেন সংস্কৃত থেকে, অতএব ভাষায় সংস্কৃত প্রভাব, তৎসম-তদ্ভব উপকরণ রয়েছে। অনুবাদ হয়েছে আরবী-ফারসী থেকে, অতএব ভাষায় আরবী-ফারসী উপকরণ অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেছে। অন্যদিকে লোক-সাহিত্যে রয়েছে জনজীবনের আঞ্চলিক ভাষার নির্দশন। প্রসঙ্গত বিশেষ করেই বলতে হয়, মধ্যযুগে প্রধানত বিদেশাগত মুসলিম আধিপত্যের পাঁচশত/সাড়ে পাঁচশত বৎসর কালে আরবী-ফারসী ভাষার উপকরণে ঋদ্ধ হয়েছে এবং বিশেষ রূপ গ্রহণ করেছে বাংলা ভাষা। দেশের অভ্যন্তরে জনপদসমূহে, প্রত্যন্ত প্রদেশসমূহে ইসলাম ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে জনজীবনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে প্রধানত আরবী ভাষার উপকরণ, এবং প্রশাসনের মারফৎ বিস্তার লাভ করেছে তুর্কী-ফারসী ভাষার উপকরণ-শব্দরাজি। এভাবে সমগ্র মধ্যযুগ ধরেই বাংলা ভাষা আত্মস্থ করেছে বিচিত্র বিদেশী শব্দ-সম্ভার ও কিয়ৎ পরিমাণে রীতি বৈশিষ্ট্য। এর মধ্যে রয়েছে—রাজদরবার-প্রশাসন-আইন-আদালত-রাজস্ব বিষয়ক শব্দ, লড়াই-শিকার বিষয়ক শব্দ, আদব-কায়দা, আচার-আচরণ, পোষাক-বিলাস দ্রব্য, নিত্য ব্যবহার্য বস্তু, ব্যবসা-বাণিজ্য-পেশা এবং ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ। মুসলমান শাসন আমলেই ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ বাংলার মাটিতে পোর্তুগীজদের পর্দাপণ। তাদের ব্যবসা বাণিজ্য আর তাদের মিশনারিদের ধর্ম প্রচার কার্যের দরুন পোর্তুগীজ শব্দরাজি ক্রমে মিশে গেছে আমাদের জনজীবনের নিত্য ব্যবহারের সাথে। আরো এসেছে ডাচদের দরুন ওলন্দাজ শব্দ, ফরাসীদের দরুন ফরাসী শব্দ। এভাবে বাংলা ভাষা-ইতিহাসের মধ্যযুগে বিদেশী শব্দরাজিতে পরিপুষ্ট হয়েছে আমাদের ভাষার ভান্ডার। অবশেষে অষ্টাদশ শতকের মধ্য ভাগ থেকে ইংরেজী শব্দের অনুপ্রবেশ। উল্লেখ যে, এদেশের রাজনীতিতে, প্রশাসনে, অর্থনীতিতে, শিক্ষায় ইংরেজ প্রভাব বিস্তারের সাথে এবং মিশনারিদের প্রচার কর্মের বিস্তারের সাথে আধুনিক যুগের সূত্রপাত। যুগপৎ ভাষা-বিবর্তনের ক্ষেত্রেও আধুনিকত্বের উদ্বোধন। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে পরবর্তী কালে প্রচুর ইংরেজি শব্দ আমরা গ্রহণ করে নিয়েছি। এমন অনেক ইংরেজি শব্দ গৃহীত হয়েছে যেগুলি বাংলায় তদ্ভব শব্দের মতো হয়ে গেছে, কদাপি সেগুলি চেহারায় ইংরেজি ছিল এমন আবিষ্কার এখন আয়াসসাধ্য। যেমন—লাট, লণ্ঠন, লম্ফ, গারদ, সান্ত্রী, জাঁদরেল, মানোয়ারী জাহাজ ইত্যাদি। হাফ হাতা জামা, ফুল মোজা, হেড মৌলবী, হেড মিস্তিরি—এ ধরনের উপসর্গ যুক্ত ইংরেজি শব্দ বাংলায় অবলীলায় চলেছে। এখন বর্তমান শতকে আন্তর্জাতিক সংযোগের প্রয়োজন এবং অবকাশ যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, ভাষা সেই মতো রূপে, আকারে বিবর্তিত হচ্ছে।

সুদূর অতীত থেকে দীর্ঘকালব্যাপী উপরোক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রমে হয়ে উঠেছে আজকের আমাদের বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষার স্বরূপ নির্ণয়ে ফলত লক্ষ্য করা যেতে পারে—ক· দেশজ উপকরণ, যা কি না আর্য-পূর্ব (অস্ট্রিক, কোল-মুন্ডা, দ্রাবিড়, তিব্বত-ব্রাহ্মণ) উপকরণ; খ· আর্য উপকরণ (বাংলা ভাষার দেহ-কাঠামো আর্য ভাষার সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রভাবে গঠিত); এবং গ· বিদেশী উপকরণ (আরবী-ফার্সী-তুর্কী, পোর্তুগীজ-ওলন্দাজ-ফরাসী-ইংরেজি এবং আধুনিক অন্যান্য)—এই সমস্ত উপকরণের সমন্বয়ে এ ভাষার বর্তমান অবয়ব সংগঠিত। অতএব আমাদের ভাষার উত্তরাধিকার, ঐতিহ্যগত কারণেই সামগ্রিকভাবে বাংলা ভাষার উত্তরাধিকার।

প্রসঙ্গত সম্প্রতি কালের একটি জিজ্ঞাসা—বিশেষ ভৌগোলিক পরিধিতে চিহ্নিত নবজাত রাষ্ট্র বাংলাদেশের ভাষার কি সুস্পষ্টভাবে বিচ্ছিন্ন স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং অন্যতর একটি রূপাবয়ব আছে ?

বলা বাহুল্য প্রত্যক্ষত তেমন কিছুর অস্তিত্ব নেই। তবে আমরা অবশ্যই অবগত আছি, ভাষা শক্তি আহরণ করে সাধারণ মানুষের জীবন-চর্চা থেকে, তার কর্ম থেকে, তার মানস ভুবন থেকে। তার সমগ্র জীবনাচরণের প্রয়োজনেই তার ভাষা স্বতস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে। অতএব সহজবোধ্য কারণেই বাংলাদেশের ভূগোল, বাংলাদেশের মানুষের উৎপাদন কর্ম-শ্রম, জীবনাচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার-ধর্মচেতনা, তার রাজনীতি, অর্থনৈতিক জীবন এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে এক বিশেষ প্রভাব ফেলবে তার ভাষায়। 'বিশেষ পরিচয়' বলতে সেটাই বাংলাদেশের আপন বাংলা ভাষা। 'বাংলাদেশের ভাষা'র যদি বর্তমান চেহারা চিহ্নিতকরণে প্রয়াসী হই, তাহলে সম্ভবত উপাদানগতভাবে এরকম বর্গীকরণ করা যেতে পারে—ক· আ×চলিক ভাষা, খ· শহুরে বা নাগরিক ভাষা—যে ভাষা সাধারণত নাগরিক জনের আলাপচারির, সভা-সমিতিতে বক্তৃতার, নাটক-চলচ্চিত্র-বেতার টেলিভিশনের ভাষা, এবং গ· লেখার ও সাহিত্যের ভাষা। উল্লেখ্য যে, উক্ত খ এবং গ বর্গভুক্ত ভাষার দ্রুত, ব্যাপক বিকাশ ১৯৪৭—এর পরবর্তী কালের ব্যাপার, অদ্যবধি আমাদের শিক্ষা, সুকুমার কলার্চচা-সাহিত্য এবং জীবিকার্জন প্রক্রিয়ার রাজধানী কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়েছে। স্বভাবতই সেই সাথে প্রমথ চৌধুরী বর্ণিত 'ভাগীরথী তীরবর্তী দক্ষিণদেশী' ভাষার ঢাকায় আগমণ। তারপর বিগত তিন দশকাধিক কাল ধরে পরবর্তিত পরিস্থিতিতে এ ভাষার সম্ভারে যা কিছু গ্রহণ-বর্জন এবং এর অবয়বে যা কিছু রূপান্তর।

বাংগালীর আত্মপরিচয়

এম আর আখতার মুকুল

বছর পঁচিশেক আগেকার কথা। তখন পাকিস্তানী আমল। "জাতীয় সংহতি, কৃষ্টি" সংক্রান্ত এক প্রোগ্রামে সাংবাদিক হিসাবে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলাম। সর্বত্রই চোখ-ধাঁধানো সম্বর্ধনা। কিন্তু লাহোরের শালিমার উদ্যানের সম্বর্ধনার তুলনা হয়না। একদিকে গোধূলির রক্তিম আকাশ, আর অন্যদিকে আলো-ঝলমল শালিমার উদ্যান। রংগিন আলোর মাঝে পানির ফোয়ারাগুলো এক অপূর্ব মাদকতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। জাঁকজমকপূর্ণ আর অপরূপ পোশাক পরিচ্ছদে সজ্জিত দম্পতিরা যখন এসে হাজির হচ্ছিলেন, তখন মনে হচ্ছিলো আমরা বোধ হয় মোগলযুগে ফিরে গেছি।

"বাংগালী ভাইদের" সম্মানে ছোট্ট একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল। বক্তৃতার পর সংগীত পরিবেশন করলেন, কোকিলকণ্ঠী নূরজাহান। তাঁর মধুর কণ্ঠে "আনমল ঘড়ী'র গান, 'মেরা বচপন্ কা সাথী মুঝে ভুল না জানা" আজও আমার মনে রয়েছে।

আমি যে টেবিলটাতে চা খেতে বসেছিলাম, সেখানে পরিচয় হলো প্রখ্যাত উর্দু দৈনিক "নওয়ায়ে ওয়াক্ত" পত্রিকার সম্পাদক মরহুম হামিদ নিজামীর সংগে। অনেক আলাপ হলো। কথায় কথায়

বললাম, "এখনও উপমহাদেশের কোথাও যদি ধর্মকে দেখতে চাও, তাহলে বাঙ্গাল মুলুকে এসো। তবে আমাদের ওখানে রাজনৈতিক স্বার্থে কেউ ধর্মকে ব্যবহার করে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি।" বিদায়ের সময় ভদ্রলোক হঠাৎ আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "আপ বাংগালী হোনে ছে কেয়া হুয়া, আপকো তো সাচ্চা মুসলমান মালুম হোতা হ্যায়।"

হামিদ নিজামী সাহেবের এই সার্টিফিকেটে মনঃক্ষুণ্ণ হলেও ব্যবহারে তা' প্রকাশ করলাম না। মনে মনে বললাম, এক হাজার মসজিদের শহর ঢাকায় আমার আস্তানা। আর তুমি আমাকে মুসলমানিত্বের সার্টিফিকেট দিচ্ছো ?

এই ক'দিনে লাহোরের বিশেষ করে উচ্চ শ্রেণীর সমাজ জীবনের যে চেহারা দেখলাম, তাতে অন্তত তোমাদের মুখে একথা না বলাটাই শোভনীয় হতো।

এর প্রায় তেরো বছর পরেকার কথা। রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের ডামাডোলে সপরিবারে ঢাকা থেকে পায়ে হেঁটে হিলির সীমান্ত অতিক্রম করে মুজিবনগরে যেয়ে হাজির হয়েছি। মাঝে মাঝে খবর সংগ্রহ আর আড্ডা দেয়ার জন্য "আকাশবাণীর" কলকাতা কেন্দ্রে সরল গুহের অফিসে যেতাম। ভদ্রলোকের আদি বাড়ি ঢাকায় এবং প্রাক পাকিস্তান যুগে ঢাকা বেতারকেন্দ্রে কিছুদিন চাকুরী করেছেন। সরলদা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কট্টর সমর্থক।

তার অফিসে বসে একদিন জোর আড্ডা হচ্ছিলো। বিখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায়, প্রখ্যাত বেতার কথক দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়, বাংলাদেশ-ভারত শিক্ষক সহায়ক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক দিলীপ ঘোষ, সাহিত্যিক "জরাসন্ধ" ও সাংবাদিক ডক্টর দিলীপ মালাকার ছাড়াও বেশ ক'জন গায়ক ও অধ্যাপক সেদিন আড্ডায় হাজির ছিলেন। কথায় কথায় বলছিলাম, আমরা বাংলাদেশে কেমন করে রবীন্দ্র-বিরোধীদের মোকাবিলা করেছিলাম। আরও বললাম, যে আপনারা চিন্তাও করতে পারেন না যে, মেয়েদের কপালে টিপ দেয়া নিয়েও একটা "ফাটা-ফাটির" অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের কড়া আদেশ মেয়েরা কপালে টিপ দিয়ে টিভির পর্দায় আসতে পারবে না। এদিকে মেয়েদের জেদ কপালে টিপ না দিয়ে ক্যামেরার সামনে যাবোনা।

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আড্ডা ভেঙ্গে গেলো। সবার কাছে বিদায় নিয়ে বেরুতে যাচ্ছি। এমন সময় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক আমার হাতে হাত মিলিয়ে বললেন, "কি আশ্চর্য মশায়, আপনারা মুসলমান হলে কি হবে, আপনারা তো দেখছি রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসেন ?"

বাইরে কিছু প্রকাশ না করলেও, কথাগুলো আমার বুকের ভিতর কচ্ কচ্ করতে শুরু করলো। মনে মনে বললাম, বাংলা ভাষার জন্য বাহান্নো সালে ঢাকায় গুলি খেলাম আর মারাত্মক আন্দোলনের মুখে ষাট দশকে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার পর স্বাধিকারের জন্য সোচ্চার হয়ে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। আর কি আশ্চর্য, ভদ্রলোক "দাদাগিরি" দেখিয়ে এখন আমাদের বাংগালীত্বের সার্টিফিকেট দিচ্ছেন ?

এর প্রায় হপ্তা দুয়েক পরে এ ঘটনার উল্লেখ করে সরলদাকে বলেছিলাম, 'একটা ব্যাপারে আপনারা বোধ হয় ভুল করছেন। ওরা যেমন আমাদের "বড় ভাইয়ার" ভূমিকায় এসে ভুল করেছিলেন, আপনারা তেমনি "দাদাগিরি" দেখালে ভুল করবেন। বড় ভাই ও ছোট ভাই-এর সম্পর্কের চেয়ে সম-মর্যাদায় বন্ধুত্বটাই সবার কাছে বেশী কাম্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।'

বাংগালী মুসলমান এক অদ্ভুত জাত। এঁরা দল বেঁধে ঈদের নামাজ পড়বে, জুম্মার নামাজ আদায় করবে, রোজা রাখবে, দাদী-নানীর কথায় বাসায় মিলাদ পড়াবে, কারো মৃত্যু সংবাদে জানাজায় শরীক হবে, পীরের দরগায় মানত করবে, হাতে তাবিজ লাগাবে, আজান শুনলে মেয়েরা মাথায় কাপড় দিবে—আরও কত কি ?

এরাই আবার একুশে ফেব্রুয়ারী করবে, রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত জয়ন্তী করবে, নববর্ষ ও হালকাতা করবে, বসন্তের আগমনে মেয়েরা বাসন্তী রঙের কাপড় পরবে, অবসর সময়ে রবীন্দ্র সংগীত শুনবে, কবিতার আসর করবে, নবান্ন করবে, বাচ্চাকে কু-নজরের হাত থেকে রক্ষার

জন্য কপালে কালো টিপ দিবে, উৎসব-পার্বনে বাড়ীর সামনে কলাগাছ লাগাবে, নববধূকে বরণের সময় উঠানে ঘড়া ভর্তি পানি ঢালবে, ছেলের হাতে খড়ি দেবে, দূর-দেশে যাওয়ার আগে গুরুজনদের পা ছুঁয়ে সালাম করবে, আরও কত কি ?

তা'হলে আমাদের আসল পরিচয়টা কি ? আমরা কিভাবে আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নির্ণয় করবো ? স্বাধীনতা লাভের এক যুগ হওয়ার পর এ-সবের একটা সুরাহা হওয়া দরকার।

বর্তমানে এই প্রবন্ধে এতসব মৌলিক বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব না হলেও কিছুটা আলোকপাতের প্রচেষ্টা করা বাঞ্ছনীয় হবে।

আলোচনার সুবিধার জন্য নিম্নোক্তভাবে প্রবন্ধটি বিভক্ত করেছি ঃ

১ বাংলাদেশের ও বাংগালী সভ্যতার আদি ইতিহাস
২ বাংগালীদের ধর্মীয় চেতনার গতিধারা
৩ মুক্তবুদ্ধি সুফী মতবাদের উন্মেষ ও প্রভাব
৪ বাংলাদেশে "পপুলার ইসলাম" ও মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা
৫ বাংগালী সংস্কৃতি ও ইসলামের সমন্বয়
৬ বাংলা ভাষার ইতিহাস
৭ বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও বাংগালীর ঐতিহ্য নির্ণয় এবং আমরা স্বতন্ত্র কেন ?

গবেষকদের মতে যে ভৌগলিক সীমারেখা নিয়ে আমাদের আবাসস্থল সেই "বংগদেশের" "বংগ" শব্দটি প্রচীনতার সাক্ষ্য বহন করছে। "বং" শব্দ থেকেই "বংগ" শব্দের বুৎপত্তি নির্ণয় করা যায়। এটি একটি সুপ্রচীন চৈনিক শব্দ। চীনা ভাষায় "বংগ" শব্দটির অর্থ হচ্ছে জলাশয়। অর্থাৎ নদী মার্তৃক এলাকা। ইতিহাসের ঘাতপ্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে "বংগ" শব্দটি "বংগদেশ", "বংগীয় এলাকা", বংগ প্রদেশ পূর্ব বংগ, পূর্ব বাংলা (পূর্ব পাকিস্তান) এবং শেষ পর্যন্ত একটি রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ—এই নামে রূপান্তিরিত হয়েছে।

বিভিন্ন দেশে মানব জাতির সভ্যতার ইতিহাসকে পরিমাপ করতে হলে কৃষি বিদ্যার প্রয়োগকে পরিমাপক হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। কেননা, কৃষি মানুষকে প্রয়োজনের তাগিদে শিখিয়েছে কারিগরি। দরকার হলো জমি-জমা, লাঙ্গল আর কৃষি যন্ত্রপাতির। আস্তে আস্তে দেখা দিলো জমির মালিকানা ও নানা সমস্যা। প্রকৃতিকে জয় করার জন্য মানুষের মনে জাগ্রত হলো অদম্য সাহস। পাশাপাশি সৃষ্টি হলো অলৌকিক বিশ্বাস, এলো ধর্মবোধ আর জ্যোতি র্বিদ্যা। সৃষ্টি হলো নানা পেশার। মানব সমাজে দেখা দিলো শ্রেণী বিভাগ। সৃষ্টি হলো শ্রেষ্ঠত্ববোধ ও স্বার্থের সংঘাত; আর শুরু হলো শোষণের ইতিহাস।

প্রাসংগিক হবে বলেই মানব জাতির ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপট স্মরণ রাখার দরকার। হাজার হাজার বছরের ব্যবধানে মানুষ প্রস্তর যুগের মতো বিভিন্ন যুগ অতিক্রম করে পশুপালন ও যাযাবরের জীবন গ্রহণ করে। কিন্তু যেসব মানবগোষ্ঠী বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে সক্ষম হলো, তারা কৃষিকার্যকে অবলম্বন করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলো। এই কার্যের জন্য প্রয়োজন হলো নদী-বিধৌত এলাকার।

তাই প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মিশরের নীল নদের তীরে, মধ্যপ্রাচ্যের ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর ধারে, সিন্ধুদের অববাহিকায়, মহেঞ্জোদারো-হরপ্পায় এবং চীনের হোয়াং হো আর ইয়াংসিকিয়াং নদী বিধৌত অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক প্রথম মানব সভ্যতার সূচনা হয়।

সুতরাং এসব সভ্যতার সমসাময়িক না হলেও পদ্মা-মেঘনা-যমুনা স্নাত বাংলাদেশের প্রশান্ত উর্বর ভূমিতে সৃষ্ট সভ্যতা যে সুপ্রাচীন তা' নিঃসন্দেহে বলা চলে। পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে (বাংলা ও বাঙ্গালী শীর্ষক প্রবন্ধ), "যখন লোকে লোহার ব্যবহার করিতে জানিত না, তখন বেতে বাঁধা নৌকায় চড়িয়া বাংগালীরা নানা দেশে ধান চাউল বিক্রয় করিতে যাইত, সে নৌকার নাম ছিল "বালাম নৌকা"। তাই সে নৌকায় যে চাউল আসিত, তার নাম বালাম চাউল হইয়াছে, বালাম বলিয়া কোনও ভাষায় কথা আছে কিনা জানিনা, কিন্তু তাহা সংস্কৃতমূলক নহে।"

এ'থেকে অনুমান করা যায়, সে যুগের মানব সমাজ যখন লোহার ব্যবহার জানতো না তখন প্রাচীন বঙ্গীয় এলাকায় ধান-চালের ব্যবসা হতো।

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে যে, প্রাচীন বাংলা ও দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে প্রায় একই ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি ও শষ্য পেষণের মুষল ইত্যাদি পাওয়া গেছে। তাই একথা প্রমাণিত হয় যে, সে যুগে বাংলাদেশ ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যে যোগাযোগ ছিলো এবং এসব কৃষি যন্ত্রপাতি দাক্ষিণাত্য থেকে এসেছে। গবেষকদের মতে উপ-মহাদেশে আর্যদের বসতি স্থাপনের পূর্বে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে দাক্ষিণাত্য, তামিলনাড়ু, উড়িষ্যা ও বাংলাদেশে দ্রাবিড় সভ্যতা বিরাজমান ছিলো। বাংলা, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম এবং সিংহলী ভাষায় ব্যবহৃত অনেক শব্দের মিল এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান। এমনকি উপমহাদেশের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশ ও দাক্ষিণাত্যের প্রধান খাদ্যই হচ্ছে ভাত। অন্যত্র গমের ব্যবহার অনেক বেশী। অশরীরী দৃষ্টি থেকে শিশু সন্তানকে রক্ষার জন্য কপালে টিপ দেয়া হয় এবং নতুন গৃহ নির্মাণের সময় বাঁশের অগ্রভাগে মনুষ্য চিত্র অঙ্কিত মাটির ভাংগা হাড়ি রাখার যে রেওয়াজ এখনও বাংলাদেশে প্রচলিত রয়েছে, তাও দ্রাবিড় রীতিনীতিরই নিদর্শন। আর্যরা এদেরই দস্যু, রাক্ষস ইত্যাদি হিসাবে আখ্যায়িত করে দ্রাবিড়দের নিশ্চিহ্ন করার জন্য বারবার দাক্ষিণাত্যে হামলা করেছে এবং ধর্মের দোহাই দিয়ে নিজেদের মনোবল বৃদ্ধির প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু আর্যরা উপমহাদেশের এই দুইটি এলাকায় সুষ্ঠুভাবে প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হয়।

ইতিমধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। ভারতের বৌদ্ধ সম্রাট কণিষ্কের আমলে (৭৮ খৃস্টাব্দে) কুষাণ সাম্রাজ্য সুদূর তুর্কিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। ইরান, আফগানিস্থান এবং পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে এখনও বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে।

বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের পতনের সংগে সংগে উপমহাদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদের পূণরুত্থান ঘটে। বছরের পর বছর ধরে উপমহাদেশ থেকে বৌদ্ধদের নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টা চলে। এ সময়ের বিস্তারিত ইতিহাস পাওয়া যায়নি। তবে এটা খুবই আশ্চর্যজনক, যে ভারতীয় অঞ্চলে বুদ্ধদেবের জন্ম এবং যেখানে শত শত বছর ধরে বৌদ্ধ ধর্মালম্বীরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলো, সেখানে পরবর্তীকালে বৌদ্ধ জনসংখ্যা কয়েকটি পাহাড়ী এলাকা ছাড়া আর নাই বললেই চলে। এ থেকেই অনুমান করা যায় যে, উপমহাদেশের সমভূমি এলাকায় ব্রাহ্মণ্যবাদের পূণরুত্থানে অত্যন্ত নৃশংসভাবে বৌদ্ধদের নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। নেপাল ও তিব্বত এলাকার বিভিন্ন গুহায় লুক্কায়িত অবস্থায় রক্ষিত বৌদ্ধ পান্ডুলিপি উদ্ধারের ফলে একথাই প্রমাণিত হয় যে, সে যুগে অহিংস বৌদ্ধদের উপর আক্রমণ তীব্রতর হলে বৌদ্ধ পন্ডিতগণ অত্যন্ত সন্তর্পণে এই সব মূল্যবান পান্ডুলিপি নেপাল ও তিব্বতের গুহায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এটাই হচ্ছে উপমহাদেশের "অন্ধকার যুগ"। এর কোনও সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায়নি বা সুপরিকল্পিতভাবে এই ইতিহাস রাখা হয়নি।

অতঃপর বিশেষ করে বঙ্গীয় এলাকার ইতিহাসের ধারাবাহিকতা খুব একটা পাওয়া যায়না। উপরন্তু এই এলাকাও নানা রাজ্যে বিভক্ত ছিলো বলে কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন এক সময়ে আরবের তপ্ত মরুভূমিতে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ঘটে এবং অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে এই ধর্ম অর্ধ বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। উপমহাদেশে সর্বপ্রথম মোহাম্মদ বিন্ কাসেমের আগমন ঘটে। ইনি পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ জয় করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন রক্ষণশীল শরিয়ৎ পন্থী ইসলামের অনুসারী। প্রায় একই সময়ে কিংবা কিছুদিনের মধ্যে আরব সওদাগররা বাণিজ্য উপলক্ষে চট্টগ্রাম অঞ্চলে আগমন করেন। এরাও শরিয়ৎপন্থী ছিলেন। স্থানীয় অধিবাসীরা এতো কঠোর নিয়মানুবর্তীতার ইসলাম ধর্ম গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেননি।

ইতিমধ্যে খোদ আরবেই মুক্তবুদ্ধির উপর ভিত্তি করে "মোতাযিলা" দর্শনের সূচনা হয়। এই দর্শন থেকেই সুফী মতবাদের আরম্ভ। অচিরেই পারস্যে এই সুফী মতবাদের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং ইরানীরা স্থানিক পরিবেশে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে ইসলামী সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে। আরবভূমিতে মোতাযিলার মুক্ত দর্শনের সমাপ্ত হলেও ইসলাম ধর্ম প্রসারের সংগে সংগে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতো এই যুক্তিবাদ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র পারস্য দেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। নবম শতাব্দী থেকে শুরু করে প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত ইরান ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় অসংখ্য সুফীসাধক, পীর-ফকির, আউলিয়া, দরবেশ, দার্শনিক ও কবির আবির্ভাব ঘটে। মহাকবি ফেরদৌসী (৯৩৪—১০২০ খৃঃ), মওলানা রুমী (১২০৭—১২৭৩ খৃঃ) কবি ওমর খইয়াম দার্শনিক ও কবি শেখ সাদী (১১৭৫—১২৯৫খৃঃ) মহাকবি হাফিজ, দার্শনিক ইবনে সিনা ও মওলানা জামী প্রমুখ মনীষীরা আজীবন সাধনায় সুফী দর্শনের ব্যাখ্যাদান করে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এরা সবাই ছিলেন সুফী মতবাদের প্রবক্তা।

ঘন ঘন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা সুফী মতবাদের অবশ্য করণীয়। সুফীরা মনে করেন যে, আল্লাহ হচ্ছেন প্রেমাস্পদ আর শরীয়তপন্থীদের মতে আল্লাহ হচ্ছেন বিচারক। প্রথম দিকে শরিয়তপন্থীরা সুফী মতবাদের বিরোধিতা করলেও পরে ইমাম গাজ্জালীর মতো প্রখ্যাত দার্শনিকও সুফী মতবাদের স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। সুফী-সাধক ও দার্শনিকদের আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেমের গভীরতা এবং আধ্যাত্মিক শক্তির অভিব্যক্তি ছাড়াও পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচারে এঁদের একাগ্রতা ও নিষ্ঠা সবাইকে বিমুগ্ধ করেছিলো। ভক্ত যদি প্রেমাস্পদকে "সিজদার" পরিবর্তে বক্ষে ধারণ করতে চায় এবং এতেই শান্তি লাভ করে, তাহলে কি প্রয়োজন তাকে দূরে সরিয়ে দেয়ার। সুফী মতবাদ হচ্ছে প্রেমের ধর্ম—এ প্রেম পরম করুণাময় আল্লাহতালার প্রতি প্রেম। সৃষ্টি প্রেমেই স্রষ্টা প্রেমের বিকাশ। পবিত্র কোরানের সমর্থনকে সম্বল করে সুফী সাধকরা জীবন ও ধর্মকে সমন্বয় করার প্রয়াস পেয়েছেন।

অত্যাচার চিরকালই মানুষের সুপ্ত শক্তির বহিঃপ্রকাশের সহায়ক। মনসুর হল্লাজ (হত্যা ঃ ৯২২ খ্রীঃ) কিংবা শেখ শিহাবুদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দীর মতো সুফী মনীষীদের হত্যা করে যেমন সুফী মতবাদের প্রচারকে রুদ্ধ করা যায়নি, তেমনি আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে ফরমান জারী করেও শরিয়তপন্থীদের মুখ বন্ধ রাখা যায়নি। মুসলিম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইমাম গাজ্জালীর (রঃ) আবির্ভাব (১০৫৮—১১১১ খ্রীঃ) এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। শরিয়তপন্থী গাজ্জালীকে "হজ্জতুল ইসলাম" বা ইসলামের যুক্তি বলা হতো। ইনি প্রায় চারশ' পুস্তক রচনা করে গেছেন। খৃস্টানদের বিরুদ্ধে দুই শতাধিক বৎসর ব্যাপী ক্রুসেডের ধর্মযুদ্ধের জের হিসাবে এবং ইম.ম গাজ্জালীর মতো শরিয়তপন্থীদের প্রচেষ্টায় অচিরেই আরব, ইরাক এমন কি সিরীয় অঞ্চল থেকেও "মোতাযিলা" অর্থাৎ সুফী মতবাদের গতি রুদ্ধ হয়। কিন্তু এর মধ্যেই পারস্যের মুসলিম সাধকরা সুফী দর্শনের পতাকাকে সমুন্নত করে দেশ থেকে দেশান্তরে বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

এ ধরনের একটা পটভূমিতে মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্থান, উজবেকিস্থান প্রভৃতি এলাকায় পবিত্র ইসলামের দ্রুত প্রসারের অব্যবহিত পরেই নানা গোত্র ও উপজাতি ইসলামের পতাকা হাতে মেসোপটেমিয়া (বর্তমান ইরাক), পারস্য ও আফগানিস্থানের মাঝ দিয়ে খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে ভারত উপমহাদেশে এসে হাজির হয়। যুগের পর যুগ ধরে তুর্কিস্থানের মুসলমানেরা ভারত আক্রমণ করেছে এবং উপ-মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত তুর্কিরা ভারতে স্থায়ীভাবে সাম্রাজের গোড়া পত্তন করে।

প্রায় ছ'শ বছর ধরে ভারত সাম্রাজ্যের মুসলিম কর্ণধাররা দোর্দন্ড প্রতাপে শাসনভার পরিচালনা করেছেন। কিন্তু তারা বরাবরই সমৃদ্ধশালী ইরানী ভাষা, সাহিত্য, দর্শন ও কালচার দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিলো। তাই দিল্লীর মসনদে তুর্কিরা ক্ষমতাসীন থাকা সত্ত্বেও ফারসী ভাষাকে রাজভাষা হিসাবে ঘোষণা করেছে এবং ইরানী সাহিত্য, দর্শন ও কালচারের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।

পবিত্র ইসলামের বাণী বহন করে এগারো শতাব্দীর গোড়ার দিকে সমরখন্দ, বোখরা, সিরিয়া এমন কি আরব ভূমি থেকেও দলে দলে সুফীসাধকরা ভারত উপমহাদেশে আগমন করেছেন। কিন্তু ইমাম

আবু হানিফার ব্যাখ্যাকৃত শরিয়তপন্থী ইসলামের সংগে এদের চিরন্তন বিরোধ অব্যাহত ছিলো এবং আজও পর্যন্ত এর জের চলছে।

তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, সুফী সাধকরা সব সময়েই ইসলামের মূল আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রেখে নিরলসভাবে ধর্ম প্রচার করে গেছেন। তাই আজ একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, যুগের পর যুগ ধরে যে সব সুফী সাধক, পীর, ফকির, আওলিয়া ও দরবেশরা সাহিত্য, দর্শন, সংগীত ও কাব্যের মাধ্যমে সুফী মতবাদ তথা ইসলামের বাণী প্রচার করতে যেয়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁরা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। দেশ থেকে দেশান্তরে পবিত্র কোরানের বাণী প্রচারের সময় এসব সুফী সাধকরা স্থানীয় সংস্কৃতি ও দর্শনকে যেভাবে পরিমার্জিত ও পরিশোধিত করে গ্রহণ যোগ্য করেছেন, তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তুর্কিস্থান থেকে শুরু করে সুদূর বাংলাদেশ পর্যন্ত এই বিরাট ভূখন্ডে শুধু ক্ষমতার দাপটে ইসলাম ধর্ম প্রচার করে তা স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে স্থায়ীভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার পুরো কৃতিত্বটাই সুফী সাধকদের। তরবারীর মাধ্যমে এক সময় স্পেন দেশেও শরিয়তপন্থী ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছিলো। কিন্তু আজ সেখানে ইসলাম ধর্মাবলম্বী কোনও পরিবারের সাক্ষাৎ পাওয়া দুষ্কর। অথচ ভারতে প্রায় আড়াইশো' বছর আগে মুসলমানরা দিল্লীর মসনদ হারিয়েছেন। কিন্তু উপমহাদেশে ইসলাম ধর্ম পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং থাকবে। পারস্য তথা মধ্য এশিয়ায় সুফী মতবাদের ব্যাপক প্রসারের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, সুফী সাধকদের কেন্দ্র করে অসংখ্য দরগাহ্ ও খানকা-শরীফ গড়ে উঠেছে। এসব দরগাহ্ ও খানকা শরীফে সুফী দর্শন চর্চা, কাব্য তথা সাহিত্য সৃষ্টি, নিত্য-নতুন সঙ্গীতের সুর-লহরী আর আল্লাহ্র "জিকিরে" মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। এমনি সময় বিজয়ীর বেশে মুসলমানদের ভারত উপমহাদেশে আগমনের সংগে সংগে ইসলাম ধর্ম প্রচারের মহান ব্রত নিয়ে শত শত সুফী, পীর, দরবেশ, ফকির ও আউলিয়া মধ্য এশিয়ার সুফী দরগাহ্ ও খান্কা-শরীফ থেকে এসে হাজির হয়। এই সব সুফী মনীষীদের কেউই আর জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেননি। উপমহাদেশের মাটিতেই এঁরা চির নিদ্রায় শায়িত। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সর্বত্র এঁদের কবর ছড়িয়ে রয়েছে। এঁদের কবরকে ভিত্তি করেই শিষ্যরা গড়ে তুলেছেন খান্কা-শরীফ অর্থাৎ সুফী মতবাদের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র।

১১৫০ খৃস্টাব্দ থেকে ১৪০০ খৃস্টাব্দ সময়কালকে উপমহাদেশে সুফী মতবাদ প্রচারের গোড়াপত্তন ও বিকাশের যুগ বলা চলে। এই সময়কালের মধ্যে বিশাল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বহু সুফী-মনীষীর এই উপমহাদেশে আগমন হয়েছে। এরা আন্তরিক নিষ্ঠা ও অদম্য মনোবল নিয়ে সুফী মতবাদের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম প্রচারে লিপ্ত ছিলেন। এদের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও নিরলস প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। এই আড়াইশ' বছর সময়কালের মধ্যে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে কুমারিকা অন্তরীপ আর খাইবার গিরিপথ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ ঘটে।

সুফী মনীষীরা উপমহাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচারের সময় ধর্মের মূল আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রেখে আঞ্চলিক সংস্কৃতি, ভাষা ও লোকাচারকে সম্মান প্রদর্শন ও যতদূর সম্ভব গ্রহণ করায় ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছিলেন।

এরই প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পাই যে, মওলানা দাউদ, কবি মিয়া সাধন, কবি কুতুবন, কবি মনঝন এবং মালিক মোহাম্মদ জায়সীর মতো সুফী সাধক ও কবিরা উপমহাদেশের উত্তর ভারতীয় অঞ্চলে পদার্পন করে যখন উপলব্ধি করলেন যে, স্থানীয় জনসাধারণ ফারসী ভাষায় অজ্ঞ, তখন এরা স্থানীয় ঠেট্ হিন্দী ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর এইসব কবিরা আঞ্চলিক লোক গাথার কাহিনী অবলম্বন করে "চন্দায়ন", "মৈনাসতবন্তী", "মৃগাবত", "মধুমালতী", এবং "পদুমাবত"—এর মতো সুফী কাব্য রচনা করেন। ঠেট্ হিন্দীতে লেখা এই সব সুফী কাব্য আঞ্চলিক লোকগাথা ভিত্তিক হওয়ায় কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর ভারতে জনপ্রিয়তার চরম শিখরে অবস্থান করেছিলো।

আবার বঙ্গীয় এলাকায় হিন্দী ভাষা বোধগম্য নয় দেখে এইসব সুফী কাব্যগ্রন্থ পরিবর্তিত পরিবেশে কবি দৌলত কাজী, কবি আলাওল, মোহাম্মদ খাতের, মোহাম্মদ কবীর প্রমুখ বাংলায় ভাবানুবাদ করেন। ফলে সুফী কাব্য গ্রন্থগুলো স্থানীয় গণমানুষের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

সুফী সাধক, মনীষী, পীর ও দরবেশরা সুফী মতবাদের মাধ্যমে পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচারের সময় সব সময়েই স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি, লোকাচার প্রভৃতিতে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন বলেই তাঁদের "মিশন" অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছিলো।

অবশ্য এই সাফল্যের পিছনে আরও কিছু কারণ রয়েছে। বঙ্গীয় এলাকায় একাদশ শতাব্দী থেকে পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচারে লিপ্ত সুফী পীর ও দরবেশেরা প্রায় সবাই চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং কিছুটা অলৌকিক শক্তির অধিকারীও ছিলেন। এইসব সুফীরা মুসলিম সুলতান ও সম্রাটদের নিকট থেকে দরগাহ্ শরীফ ও মসজিদের জন্য "ওয়াকফ" জমি লাভ করেছিলেন। ফলে এইসব দরগাহ্ ও খান্‌কা-শরীফগুলোই উদার ইসলাম ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশের যেকোনও এলাকায় এসবের নিদর্শন বর্তমান। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শত শত সুফী পীর, দরবেশ, ফকির ও আউলিয়ার কবর ছড়িয়ে রয়েছে। এইসব সুফী মনীষীরা তাঁদের পীরের নির্দেশে চিরদিনের জন্য জন্মভূমি পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে উপমহাদেশে আগমন করেছিলেন। বাংলাদেশ তার উজ্জ্বল স্বাক্ষরবহন করছে। এঁদের বুকে ছিলো অদম্য সাহস ও মনোবল। এঁদের ত্যাগ ও তিতিক্ষা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।

প্রখ্যাত গবেষক ডক্টর এনামুল হক সুফী মতবাদের মাধ্যমে বঙ্গীয় এলাকায় প্রচারিত ইসলামকে "পপুলার ইসলাম" বলে আখ্যায়িত করেছেন। মোগল সম্রাট হুমায়ুনের নিকট পাঠান সম্রাট শেরশাহ সূরীর পরাজয়ের পর যখন পাঠানরা দলে দলে পলায়ন করে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা বিধৌত এলাকায় আশ্রয় নেন, তখন তারা উপলব্ধি করতে পারেন যে, তাঁদের পক্ষে আর স্বীয় জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব নয়। ফলে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে এঁরা নিজস্ব স্বকীয়তার পাশাপাশি বাংলার সংস্কৃতি লোকাচার এবং ভাষাকে গ্রহণ করেন। এমনকি স্থানীয়ভাবে এঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসার ধর্ম পালনে মনযোগী হন এবং কালক্রমে নিজেদের বাংগালী বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেননি।

দ্বিতীয়তঃ যুগের পর যুগ ধরে সুফী সাধকদের নিরলস প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় এলাকায় বিপুল সংখ্যক লোক ধর্মান্তরিত হয়ে পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হিন্দুদের মধ্যে বর্ণ ও শ্রেণী বিভাগের ভয়াবহ অত্যাচার-এর অন্যতম কারণ। এই অত্যাচারিত জনগোষ্ঠী আকস্মিকভাবে সুফীদের মাধ্যমে ইসলামের মতো একটা উদার ধর্মকে অবলম্বন করার সুযোগ লাভ করে। এই সময় বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচাররত সুফী, দরবেশ পীর, ফকির ও মনীষীরা হৃদয়ের বিশালতা প্রকাশে সক্ষম হয়েছিলেন। এক নিরাকার আল্লাহ্, পবিত্র কোরান তাঁর প্রেরিত বাণী আর রাসুলে করীম (সঃ) হচ্ছেন শেষ পয়গম্বর—এসব বিশ্বাস করে যারাই ঈমান এনেছেন এবং নামাজ, রোজা হজ্ব ও জাকাতের বাধ্যবাধকতা মেনে নিয়েছিলেন, এরা তাদেরই ধর্মান্তরিত করে পবিত্র ইসলামের ছত্রছায়ায় গ্রহণ করেছেন।

তাই নব্য মুসলমানরা স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার সবকিছুতেই বাংগালীত্ব অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এটাই হচ্ছে তৎকালে বঙ্গীয় এলাকায় ইসলাম ধর্ম প্রচাররত সুফী পীর ও দরবেশদের মানসিক উদারতার বহিঃপ্রকাশ। এর মোকাবেলায় হিন্দু পন্ডিত পুরোহিতরা এই বিরাট জনগোষ্ঠীকে ধর্মান্তকরণে বাধাদান করে বিশেষ সফল হতে পারেন নি।

সুফী পীর ও দরবেশরা কোনও সময়েই জন্মসূত্রে মুসলমান এবং ধর্মান্তরিত মুসলমানদের পৃথক করে দেখেন নি। সবাইকে সমদৃষ্টিভঙ্গি থেকে একই জামাতে গ্রহন করেছেন। অবশ্য জন্মসূত্রে মুসলমান কোনও কোনও "শরীফ পরিবার" নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রাখার প্রচেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে।

সুফী পীর, দরবেশ, ফকির ও আউলিয়াদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে বঙ্গীয় এলাকায় অত্যন্ত সন্তর্পনে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে এক নব্য দর্শনের সৃষ্টি হয়। এখানকার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মনে দেখা দেয় বিরাট আস্থার ভাব। এরা সবাই উপলব্ধি করেন—"এই দেশ আমার, এই ভাষা সংস্কৃতি, লোকাচার কৃষ্টি সবকিছুই আমার। আমি এই দেশের বাংগালী সন্তান এবং ধর্ম বিশ্বাসে আমি মুসলমান।"

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই দর্শন বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের (পাকিস্তান) পর প্রায় হাজার মাইলের ব্যবধানে একটা বিশেষ ভৌগোলিক সীমারেখায় বাংগালী মুসলমানরা তার বাংলা ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতির আলোকে নিজস্ব স্বকীয়তায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। অথচ দিল্লীতে প্রায় সাত'শ বছর রাজত্ব করেও মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি।

ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপটে দেখতে পাই যে, বাস্তবতাকে স্বীকার করতে না পেরে সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের সময় আর্যদের উত্তরসূরীর দাবীদার বর্ণহিন্দুরা দেশত্যাগ করেছেন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর 'শরাফত' ও 'খান্দানী' মুসলমানরা বিতাড়িত হয়েছেন। কেননা, ইতিহাসের গতিধারাকে কোন শক্তিই রুদ্ধ করে রাখতে পারেনা।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করতে চাই, সাতচল্লিশের ভারত বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় ১২/১৪ লাখের মতো অবাংগালী মুসলমানের আগমন হয়েছিলো। কিন্তু তৎকালীন শাসকবর্গ নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে মোহাম্মদপুর, মীরপুর, সান্তাহার, বগুড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর, সৈয়দপুর, রংপুর, লালমনিরহাট, চট্টগ্রাম ইত্যাদি স্থানে এদের পকেট বানিয়েছিলেন। পাকিস্তানের চব্বিশ বছরে স্থানীয় সংস্কৃতি, লোকাচার, রীতি-নীতি রপ্ত করাতো দূরের কথা এরা বাংলা ভাষা পর্যন্ত শিখে নাই। এমনকি স্থানীয় অধিবাসীদের সংগে এরা বৈবাহিক সম্পর্ক পর্যন্ত স্থাপন করে নাই। এর ফল হিসাবে একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বরের পর এদের আবার দেশত্যাগ করতে হয়েছে।

একইভাবে ভারত ও পাকিস্তান থেকে এক সময় হাজার হাজার ব্যবসায়ী আফ্রিকার কেনিয়া, উগান্ডা, প্রভৃতি দেশে বসতি স্থাপন করেছিলো। কিন্তু তাঁরা স্থানীয় সংস্কৃতি, লোকাচার, রীতি-পদ্ধতি ইত্যাদি সযত্নে পরিহার করেছিলো। এমনকি স্থানীয় ভাষা পর্যন্ত শেখাকে ঘৃন্য বলে বিবেচনা করেছে।

এরই ফল হিসাবে, এখন এঁরা আবার বাস্তুচ্যুত হয়ে বৃটেনে আস্তানা গেড়েছে। এঁদের কোনও দেশ নেই, কোনও ভাষা—সংস্কৃতি নেই এবং কোনও ঐতিহ্য নেই। এক কথায় এঁদের গর্ব করার কিছুই নেই। এরা সবারই করুণার পাত্র।

এই প্রেক্ষাপটে বিচার করলে একাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে সুফী মনীষীরা বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারের সময় যে উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন তার সুদূর প্রসারী ফল প্রমাণিত হয়েছে। যে সব বহিরাগত মুসলমান বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করেছে এবং যারা হিন্দু ধর্মের বর্ণ ও শ্রেণী বিভাগের অত্যাচারে ধর্মান্তরিত হয়েছেন, এরা সবাই এদেশেরই সন্তান, এখানকার পরিবেশে সৃষ্ট কৃষ্টি ও সংস্কৃতির দাবীদার এরাই এবং স্বীয় মাতৃভূমি হিসাবে বাংলাদেশকে নিয়ে এরা গর্ব অনুভব করে বলেই সবাই বাংগালী ও ধর্মে মুসলমান।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, বাংগালী মুসলমান বড় অদ্ভুত জাত। আমাদের পিতামাতা আকিকা করে পোষাকী নাম রাখার সময় আরবী ও পারসী লম্বা নাম রাখা পছন্দ করে থাকেন। আবার নিজেদের অন্তরের সুপ্ত বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য ছেলেমেয়েদের বাংলা ডাক নামে অভিহিত করে। এসব ডাক নামের মধ্যে খোকা, বাবু ঝিনুক, মায়া, পটল, চাঁপা, দীপ্তি হাসি, খুকী, মানিক, ভোলা, লাল, মাখন, কবিতা, লতা, ইরা, মমতা, বনানী, সুরুজ প্রভৃতি নাম খুবই প্রচলিত। আজকাল তো আবার অনেকেই পোষাকী আরবী বা ফারসী নামের সঙ্গে ডাক

নামটাও জুড়ে দিচ্ছেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক মরহুম তফাজ্জল হোসেন তো' মানিক মিয়া নামেই সমধিক পরিচিত। রাজনীতিবিদদের মধ্যে মোহন মিয়া, যাদু ভাই, ইনু, মেনন প্রমুখ এদের ডাক নামে চিহ্নিত হয়ে রয়েছেন।

এই প্রসংগে কতকগুলো আরবী ও ফারসী নাম কিভাবে বাংগালীত্বের রূপ ধারণ করেছে তার উল্লেখ প্রাসাংগিক হবে মনে করছি।

আরবী/ফারসী নাম	বাংগালীত্বে রূপায়ন
১ আয়েশা	আশা
২ মায়মুন্নাহ্	ময়না
৩ থানাউল্লাহ্	সোনাউল্লাহ
৪ কুলসুম	কুসুম
৫ মালিহা	মালা
৬ থামিরন	সমীরণ
৭ লতিফাহ	লতা
৮ চেমন্ আরা	চম্পা
৯ মক্‌বুল	মুকুল প্রভৃতি

এছাড়া স্থানিক পরিবেশে উচ্চারণের সুবিধার জন্য বাংলাদেশে অনেক নামই বেশ তফাৎ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন ইদ্রিস থেকে 'ইদু' পীর বকস থেকে 'পীরু' এনায়েৎ থেকে ইনু এ ধরনের প্রচুর উদাহরণ রয়েছে।

আবার গ্রামাঞ্চলে কিছু সংখ্যক অর্থহীন ডাকনাম দেখা যায়। যেমন, গেদা, টুনু, কালা, সেরু, পুঁটি, ভুটি, হিদু, চিকন, গেদী, পুটু ইত্যাদি। এ সবই হচ্ছে স্থানিক পরিবেশের প্রভাব।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, গ্রাম বাংলায় 'লায়লা-মজনু', 'ইউসুফ-জোলেখা', 'ইমাম বিজয়', 'রসূল-বিজয়', 'আলিফ-লায়লা', 'হানিফা-কররাপরী', 'দাস্তান-ই-আমীর হামজা', সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান প্রভৃতি আরবী ও ফারসী কাহিনী অবলম্বনে লিখিত পুঁথি সাহিত্য যেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, ঠিক তেমনিভাবে 'চাঁদ সওদাগর', 'বেহুলা', 'চৌতিশা', 'বিদ্যাসুন্দর', 'মনসা মঙ্গল', 'সোনাভান' 'জ্ঞানসাগর', (আলী রাজা), জ্ঞানপ্রদীপ' (সায়ইদ সুলতান), যোগকলন্দর, (সৈয়দ মুর্তাজা), 'কাফনচোর', পদ্মাবতী', 'মধুমালতী, 'মৃগাবতী', 'সতী ময়না', ও চান্দায়ন প্রভৃতি কাব্য কাহিনীও গণ-মানুষের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছে।

এক শ্রেণীর কাহিনীকে বাদ দিয়ে আর এক শ্রেণীর কাব্য-কাহিনীকে পৃথক করে বাংগালী মুসলমানদের মানসিকতার বিচার করা নিশ্চিতভাবে অযৌক্তিক বলে মনে হয়। পদ্মা-মেঘনা-যমুনা বিধৌতিত এই বাংলার পলি মাটিতে অত্যন্ত সর্তপণে এসবের সমন্বয় ঘটেছে এবং কালের আবর্তে তা আনরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমারেখার পূর্ব ইতিহাস, বাংগালী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির আদি ইতিহাস এবং বাংগালীর ধর্ম বিশ্বাসের ক্রম বিবর্তনের ধারায় নাতি দীর্ঘ আলোচনার পর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণতা প্রাপ্তি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় হবে।

প্রখ্যাত গবেষক শ্রী অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়ের মতে, "পূর্ব ভারতের একটি বিশিষ্ট ঐতিহ্যমন্ডিত ভৌগলিক সংস্থানের মধ্যে প্রায় সহস্রাধিক বৎসর ধরে যে জীবনাদর্শ,

আধিমানসিক স্বরূপ ও শিল্প সম্যকর্ষ বিকাশ লাভ করেছে। তার শ্রেষ্ঠ প্রতীকের নাম বাংলা সাহিত্য।" একথা অস্বকীর করার উপায় নেই যে, প্রাচীন, মধ্যযুগীয় অথবা আধুনিক—যেকালের সাহিত্যই হোক না কেন, বাংগালীর সমগ্র চেতনা প্রবাহ এর মধ্যে ধরা পড়েছে।

সহস্রাধিক বছরের প্রাচীন যদি বাংলা ভাষা হয়ে থাকে, তাহলে এর পূর্বের অবস্থাটা কি ছিলো ? আগেই বলেছি যে; এই এলাকায় আদিতে দ্রাবিড় সভ্যতা বিরজমান ছিল এবং আর্যরা কোন সময়েই এঁদের সুনজরে দেখতে পারেন নি। এটা এমন একটা সময় ছিলো, যখন আর্যরা পূর্ব বঙ্গে এলে জাত যেতো। সাহসী আর্য যুবকরা এদেশে যাতায়াত করলে কপালে 'কলঙ্ক-তিলক' এঁকে দেয়া হতো। এরপর নানা প্রায়শ্চিত্তমূলক যাগযজ্ঞাদি করার পর এসব যুবকরা আবার জাতে স্থান পেতো। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, পরবর্তীকালে আর্যরা রাঢ়-বরেন্দ্রবঙ্গ—বাংলাদেশের এই তিনটি অঞ্চলের মধ্যে রাঢ় অঞ্চলে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করলেও উত্তরে 'বরেন্দ্র'ও পূর্ব 'বঙ্গ' এলাকাকে অনাদৃত ও অবহেলিত বিবেচনা করতো।

তাই প্রকৃত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পূর্ণতা লাভ করার পূর্বে সর্বপ্রথম খ্রীঃ পূর্ব ১৫০০ থেকে খৃঃ পূর্ব ৬০০ অব্দ পর্যন্ত প্রাকৃত ভাষার অস্তিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। এরপর খৃঃ পূর্ব ৬০০ থেকে খৃঃ পূর্ব ২০০ অব্দ পালি ভাষার প্রচলন ছিলো বলে জানা যায়। পোষাকী পালি ভাষা বুদ্ধদেবের নিদের্শে জন্ম লাভ করেছিলো। তিনি সনসাধারণের বোধগম্যের জন্য প্রাকৃত ভাষায় (খৃঃ পূঃ ২০০ থেকে ৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) ধর্মীয় উপদেশ লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করেন। বুদ্ধদেব বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংস্কৃত ভাষা পরিহার করতে বলে ছিলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণ্যবাদের পূনরুত্থানের ফলে ৬০০ খৃঃ থেকে ১০০০ খৃঃ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে ব্যাকরণের বাঁধ ভেংগে যাওয়ায় আর্য পন্ডিতেরা এ যুগকে বাংলা ভাষার 'অপভ্রংশের যুগ' বলে আখ্যায়িত করেন। উপরন্তুখএসব পন্ডিতদের মতে 'বাংলা ভাষার উচ্চারণ আরও বিকৃতপ্রাপ্ত হয়।' আসলে স্থানীয় গণ-মানুষ বাংলা ভাষা ব্যবহার শুরু করায় পন্ডিতরা বিরক্তুখবোধ করেন। এই অপভ্রংশ বাংলা ভাষার অন্যতম শাখা। মাগধী অপভ্রংশ থেকে বর্তমান বাংলা ভাষার সূচনা। খৃঃ দশম শতাব্দী থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা ভাষা নানা পরিবর্তনের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এই সময়কাল প্রায় এক হাজার বছরের মতো। তিন পর্যায়ে এই সময়কালকে বিভক্তুখকরা যায়। আদিযুগের বাংলাভাষা খৃঃ দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই যুগেই 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' রচিত হয়েছিল। পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ খৃঃ বাংলা পুঁথির সন্ধানে নেপালে গমন করে 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' আবিস্কার করতে সক্ষম হন। সংক্ষেপে এটাই হচ্ছে 'চর্যাপদ'। শ্রী শাস্ত্রী নেপাল থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করে ১৯২৬ খৃঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে চর্যাপদের উপর ভিত্তি করে 'হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা' সগ্মপাদিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

প্রখ্যাত ভাষাবিদ ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় উভয়েই চর্যাপদের ভাষাতত্তব সম্পর্কে আলোচনা করে মত প্রকাশ করেছেন যে, এর রচনাকাল দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। চর্যাপদে বৌদ্ধ ধর্মের 'বজ্রযান' ও 'সহজযান' সম্পর্কে গূঢ় ধর্ম, সাধারণ প্রণালী ও দশর্নতত্তেবর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। চর্যাপদের পদগুচ্ছে তৎকালীন বাংগালীর দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ ও দুঃখ-আনন্দের রেখাচিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ভাষাতত্তব, সমাজতত্তব, দার্শনিকতা এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সার্থক দৃষ্টান্ত হিসাবে চর্যাপদ এক অবস্মরণীয় সংকলন।

এর পরবর্তী যুগের সময়কাল খৃঃ চর্তুদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়কালকে চিনি্হত করা যায়। এসময় একদিকে শ্রীকীর্তন কাব্য, পদাবলী, মঙ্গল কাব্য, বৈনষব সাহিত্য প্রভৃতি আর অন্যদিকে 'চন্দায়ন', 'পদুমাবত', 'মধুমালতী', 'মৃগাবতী', 'মৈনাসত', 'লায়লা-মজনু', 'ইউসুফ-জোলেখা', 'হস্তপয়কর', 'গুলেবকাওয়ালী' প্রভৃতি সুফী কাব্য বাংলা সাহিত্যকে সঞ্জীবিত করে। বাংলার মুসলিম সুলতানরা ব্যাপকভাবে বাংলা সাহিত্যকে পষ্ঠপোসকতা করেন।

অতঃপর ইংরেজদের আগমনে কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠলে প্রায় দু'শ বছর পর্যন্ত বাংগালী মুসলমানরা ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষ প্রসূত হয়ে দূরে সরে থাকে। একথা অনস্বীকার্য যে, এ সময় বাংলা সাহিত্যে মুসলিমদের অবদান খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। তবুও আধুনিক বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্র নাথের পাশাপাশি কাজী নজরুল ইসলাম এবং পরবর্তীকালে জসিমউদ্দিন ও সৈয়দ মুজতবা আলীর অবদান নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করেছে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় বঙ্গদেশ বিভক্তখহয়ে মধ্য, উত্তর ও পূর্ব এলাকা নিয়ে স্বতন্ত্র বাংগালী মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব বাংলা গঠিত হলে নতুনভাবে ঢাকা কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠতে শুরু করে এবং স্থানীয় সাহিত্যিকরা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য নির্ণয়ে তৎপর হন। পাকিস্তানের চব্বিশ বছরে বাংলা ভাষার উপর শাসকগোষ্ঠীর আঘাত এলে তা পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিহত করে এবং প্রথমে স্বাধিকার আন্দোলন ও পরে রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার সংগে সংগে নতুন প্রেক্ষাপটের সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশের রাষ্ট্র ভাষা হচ্ছে বাংলা। তাই বিশ্বের দরবারে এই ভাষার মর্যদা রক্ষা এবং সুষ্ঠুভাবে লালিত-পালিত করার পুরো দায়িত্বটা আমাদেরই। যেমন বর্তমান বিশ্বে ইংরেজী ভাষা আন্তর্জাতিকতার রূপ গ্রহন করে নিউজিল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রভাষা হওয়া সত্তেবও এই ইংরেজী ভাষার মর্যদা রক্ষা ও প্রতিপালিত করার মূল দায়িত্ব বৃটিশদের। তেমনিভাবে পশ্চিম বাংলা, বিহার ও আসামের একাংশ এবং মধ্যপ্রাচ্য ও বৃটেনে বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী থাকা সত্তেবও এখন এর মর্যাদা রক্ষা আর প্রতিপালন করার মূল দায়িত্ব এই বাংলাদেশের বাঙ্গালীদের।

তাহলে বাংলাভাষার ঐতিহ্যটা কিভাবে নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয় হবে ? ইতিপূর্বে বাংলা ভাষার ইতিহাস বর্ণনা করতে যেয়ে প্রাকৃত, পালি, অপভ্রংশ, চর্যাপদ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য ও ভাষার যে নাতিদীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করেছি, তার সবটুকুই আমাদের সাহিত্য ঐতিহ্য হিসাবে চিনি্হত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ এই ঐতিহ্য বাংলাদেশের ঐতিহ্য এবং বাংগালী জাতির পূর্বসূরীদের গৌরবোজ্জল ঐতিহ্য। বাংলা সাহিত্যের স্রোতস্বিনী ধারা দ্রাবিড় সভ্যতা, বৌদ্ধ সভ্যতা, ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্য, সুফী সাধকদের অবদান, মুসলীম সুলতানদের মাঝ দিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে।

তবে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের সময় বাংলা সাহিত্যের ধারা দ্বিধাবিভক্তখহয়ে গেছে। রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত পর্যন্ত উভয় বাংলার যৌথ সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এরপর গত ৩৬ বছরে ওপার বাংলায় যে সাহিত্য রচিত হয়েছে, তা' আমাদের ছেলে-মেয়ের জন্য রিসার্চের বিষয় হতে পারে—দৈনন্দিন জীবনে তা' বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় নয়। বাংলা সাহিত্যের মূল ধারার উত্তরসূরী হচ্ছি আমরাই সাত চল্লিশের পর কবি ফররুখ আহমেদ, মুনীর

চৌধুরী, হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান-এর প্রতিভা দিয়ে এই মূল বাংলা সাহিত্য সাফল্যের ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে বিশ্বের দরবারে স্থান করে নিচ্ছে।

বাংলাদেশের বর্তমান ভৌগলিক সীমারেখায় আমাদের জীবনযাত্রা, জাতীয় রাজনীতি, আমাদের সংস্কৃতি ও কৃষি আর ধর্মীয় প্রভাব বাংলাভাষায় নিত্য-নতুন শব্দ সংযোজন থেকে কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ছোট গল্প সব কিছু প্রভাবিত হতে বাধ্য। বিশ্বের ইংরেজী, ফারসী, রুশ কিংবা চৈনিক ভাষা ও সাহিত্যের উদ্দাম গতিতে স্বকীয়তা সৃষ্টির মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে। এখানে উপর থেকে কিছুই চাপিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। অতীতে এ ব্যাপারে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা হতে বাধ্য।

ইংরেজরা যেমন মার্কিনী ইংরেজীর বানান কিংবা উচ্চারণ শুদ্ধ করার চেষ্টা করেন না, কিংবা অষ্ট্রেলীয়দের ককনী ইংরেজী বলতে বারণ করে না, আমরাও তেমনি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অঞ্চল বিশেষের মাতৃভাষার ব্যবহারের বিশেষ ঢং-এর আপত্তি করবো না। অবশ্য অন্যের নির্দেশিত পথও অবলম্বন করবো না। আবার ধর্মের নামে আরবী, ফারসী কিংবা উর্দু শব্দ জোর করে অনুপ্রবেশ করাবো না। প্রায় তিন যুগ প্রচেষ্টা করে ময়মনসিংহকে নগর করা যায়নি, অথচ সবার অলক্ষ্যেই 'খোদা হাফেজ' শব্দ আমাদের ভাষায় দিব্বি অনুপ্রবেশ করে বসে রয়েছে। আবার অন্যদিকে 'পানি' শব্দকে আমরা 'জল' বলতে পারিনি। কিন্তু 'ছিনতাই' শব্দটা স্বাধীনতার পর পর ওপার বাংলা থেকে এসে চমৎকারভাবে আমাদের ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। 'আব্বা ও আম্মা'র পাশা-পাশি 'মা' আর 'বাবা' শব্দ দুটো বাংলাদেশে বহুল প্রচারিত। শেষ পর্যন্ত কোনটা টিকে থাকবে কেউই বলতে পারেন না। তাই আবারও বলতে চাই যে, ভাষাকে তার নিজের গতিতে চলতে দেয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ।

পরিশেষে স্বাধীনতা লাভের প্রায় এক যুগ গত হওয়ার পর বাংলাদেশের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলের কাছে অনুরোধ, আমাদের দেশের, জাতির, ভাষার, সাহিত্যের, কৃষির—এসব কিছুর ঐতিহ্য চিনি্হত ও নির্ণয় করুন। আর প্রশ্নবোধক চিন্হ নয়। এসবের একটা সুরাহা হওয়া দরকার। তা হলেই আমরা সম্মুখ পানে এগিয়ে যেতে পারবো।

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের চিন্তাধারা ও স্বাধীন এবং মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন হবে এটাই সবার কাম্য।

সহায়ক পুস্তকাবলীর নামঃ-

১। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (সংশোধিত ৪র্থ সংস্করণ),
—শ্রী অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়।
২। পারস্য প্রতিভা (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড একত্রে),
—মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ।
৩। খনার বচন ও কৃষি
—অধ্যাপক আলি নেওয়াজ।
৪। বাংলা রোমান্টিক প্রনয়োপখ্যান
—ডঃ ওয়াকিল আহমেদ।
৫। বাংলায় সূফী সাহিত্য
—আহমদ শরীফ।
৬। এ হিষ্ট্রি অব সুফীজম ইন বেঙ্গল
—মোহাম্মদ এনামূল হক।

এক নজরে বাংলা ভাষার ইতিহাস ও বিবর্তন

১	**খৃস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে খৃস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ**	ঃ	প্রাকৃত ভাষা (দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা)
২	**খৃস্টপূর্ব ৬০০ থেকে খৃস্টপূর্ব ২০০ অব্দ**	ঃ	পোশাকী পালি ভাষা (বৌদ্ধ সভ্যতা)
৩	**খৃস্টপূর্ব ২০০ থেকে খৃস্টাব্দ ৬০০ পর্যন্ত**	ঃ	সংস্কৃত বিবর্জিত প্রাকৃত (বৌদ্ধ সভ্যতা)
৪	**খৃস্টাব্দ ৬০০ থেকে খৃস্টাব্দ ১০০০ পর্যন্ত**	ঃ	অপভ্রংশের যুগ এবং মাগধী অপভ্রংশের যুগ এবং মাগধী অপভ্রংশের উত্তরসুরি হিসাবে বাংলা ভাষার জন্ম
৫	**খৃস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী**	ঃ	বৌদ্ধ চর্যাপদের যুগ
৬	**খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী**	ঃ	বাংলা ভাষায় একদিকে বৈষ্ণব সাহিত্য এবং অন্যদিকে সুফী কাব্য ও মুসলিম সুলতানদের পৃষ্টপোষকতার যুগ (মুসলিম সভ্যতা)
৭	**খৃস্টীয় উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত**	ঃ	কলকাতা কেন্দ্রিক আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনা এবং ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষের দরুন মুসলিমদের বাংলা ভাষার প্রতি বেশ কিছুটা অনীহা। (ইংরেজ সভ্যতা)
৮	**১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত**	ঃ	রবীন্দ্রী-নজরুল-সুকান্তের পর বাংলা ভাষার মূল স্রোতের উপর ভিত্তি করে পূর্ব বাংলার ঢাকা কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন। বাংলা ভাষাকে রাতারাতি মুসলমানী করার এবং আরবী হরফ চালুর ব্যর্থ প্রচেষ্টা ও মহান ভাষা আন্দোলন (পাকিস্তান যুগ)

৯ স্বাধীনতা-উত্তর যুগ

: সমগ্র বিশ্বে একমাত্র বাংলাদেশেই রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়ার প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, ও কৃষ্টি রক্ষার দায়িত্ব বাংলাদেশের অধিবাসীদের। এরা জাতিতে বাঙালী এবং ধর্মবিশ্বাসে অধিকাংশ মুসলমান। এঁরাই হচ্ছেন বাংলা ভাষার মূল স্রোতের উত্তররাধিকারী।